আমার নামাজি সন্তান

হানা বিনতে আব্দুল আযিয

সদরুল আমীন সাকিব
অনূদিত

আপনার সন্তানের নামাজের ব্যাপারে এগুলোই কি আপনার অভিযোগ?

* আমার সামনেই কেবল পড়ে, অনুপস্থিতির সময় পড়ে না!
* কয়েক ওয়াক্তের ফরজ জমিয়ে একসাথে পড়ে ফেলে!
* পড়ে, কিন্তু অনেক বলা-কওয়ার পর!
* অনেক জেদি, প্রহারেও কাজ হচ্ছে না!
* একবার পড়লে দুইবার পড়ে না!
* খুব ঘুমকাতুরে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি!
* ঘুম থেকে না জাগার কারণে খুব যাতনা অনুভব করি!
* কোনোরকম উঠবস করে দ্রুত শেষ করে ফেলে!

আমার নামাজি সন্তান

হানা বিনতে আব্দুল আযিয
অনুবাদ: সদরুল আমীন সাকিব

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ তায়ালার জন্য। আমাদের প্রিয়নবি এবং তার চিরকালীণ সাথিসঙ্গীদের ওপর আল্লাহ বর্ষণ করুন রহমত ও শান্তির ধারা।

পরসমাচার,

বাচ্চাদের প্রতি একধরনের অকৃত্রিম ভালো লাগা কাজ করে মনের ভেতর। আহা, ওরা কতো নির্মল, নিষ্কলুষ। ওদের ছোট্ট মনটুকুর ভেতর কত সহজসরল ভাবনা আর ছেলেখেলার কল্পনা উড়ে বেড়ায় প্রতিনিয়ত। চোখ জুড়িয়ে যায় আরো, যখন ছোট্ট মানুষগুলোর ইবাদতে-মগ্ন ছবি ভেসে ওঠে চোখের পাতায়। এ দৃষ্টি আর ফেরানোর নয় যেন। মনে হয়, আহা, আল্লাহ না জানি কত মধুর নয়নে চেয়ে দেখছেন এদের আনকোরা ইবাদতটুকু।

আমার 'একপ্রিয় ছোট্টমানুষ'-এর কথা মনে আছে। একবার আমার নামাজ শেষ হলে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এটা এভাবে করেছেন কেন?" তখন বুঝি আমার নবিযুগের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, যখন সাহাবিরা নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিটি রুকু-সেজদা পর্যবেক্ষণ করতেন শেখার জন্য। সত্য বলতে, অভিভাবক ও বড়োদের সমস্ত কাজকে ছোটোরা এভাবেই পর্যবেক্ষণ করে এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। তবে ভাবনার বিষয় হলো, ওদের সরল প্রকৃতি ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম না হওয়ায় বড়োদের মন্দাচারকেও ঠিক ভালোগুলোর মতোই গ্রহণ করে নেয়। যার বিন্দু-বিন্দু প্রবিষ্ট হওয়া উপাদানের তুমুল প্রকাশ ঘটে তারা পরিপক্ক হওয়ার পর।

কিন্তু তখন সময় গড়িয়ে যায়। কারণ, ছোটোবেলা প্রতিটি মানুষের যেমন প্রিয়, প্রকৃতিরও তেমন আকাঙ্ক্ষিত—সেও নিজের তিল-তিল করে গড়ে ওঠা অস্তিত্বকে বিসর্জন দিতে নাছোড় আচরণ করে। সুতরাং, বাচ্চাদের ছোটোকাল থেকেই নৈতিকতা ও নামাজের ওপর গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। শেষবেলায় নিজের জন্য আফসোস ও হাহাকারের সুযোগ রাখা মোটেও উচিত নয়।

দ্বীনে ইসলামের ইবাদতগুলোর মধ্যে নামাজের গুরুত্ব সর্বপ্রথম। কেয়ামতের দিন হিসেবও দিতে হবে সবার প্রথম এই নামাজের। আবার হাদিসের মধ্যে বাচ্চাদের নামাজের দিক-নির্দেশনা দিয়ে সরাসরি নির্দেশও এসেছে। সব মিলিয়ে আমাদের প্রিয় পুতুলগুলোর নামাজের তদারকি করার গুরুত্ব অবশ্যই চূড়ান্ত পর্যায়ের। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি অত্যন্ত প্রিয় একটি বিষয়ের ওপর কাজ করার তওফিক দিয়েছেন। আমাদের পিচ্চি প্রজন্ম যদি বইটির ওসিলায় উপকৃত হতে পারে, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে, তবে এ হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এক অর্জন।

অনূদিত বইটিতে একজন সংকলকের এক বিষয়ক দুটি পুস্তিকার অনুবাদ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে:

تجارب الآباء والأمهات لتعويد الأولاد على الصلاة

আর দ্বিতীয়টি:

طريقة ٩٢ لتعويد أولادك على الصلاة

প্রথম পুস্তিকাটিতে বিভিন্ন অভিভাবক তাদের সন্তানকে কীভাবে নামাজি করে গড়ে তুলেছেন, সে-সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি মূলত প্রথম পুস্তিকায় উল্লেখিত অভিজ্ঞতাগুলোর সারসংক্ষেপ; সেখানে ছোটো করে পয়েন্ট আকারে শিশু-নামাজশিক্ষার ব্যাপারে ৯২টি নির্দেশনা উপস্থাপিত হয়েছে। আশা করি, উভয়টি দ্বারাই অভিভাবকগণ উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, বইটি মধ্যপাচ্যের সংকলন হওয়ায় সেই অঞ্চলের অনুসৃত মাজহাব, মতামত অনুযায়ী ফিকহি বিষয়াদি উল্লেখ করা হয়েছিল। অতএব, পাঠকের সুবিধার্থে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চলের অনুসৃত হানাফি মাজহাবের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি না হওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হয়েছে। সে-জন্য কিছু বিষয় বিয়োজন করা হয়েছে, কিছু স্থানে মূলভাব ঠিক রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে, কিছু স্থানে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। তবে এসবের কারণে বইয়ের মূল আহ্বানে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

এ ছাড়া, প্রথম পুস্তিকাটি শিরোনামবিহীন ক্রমিক নম্বর আকারে সাজানো হয়েছিল। প্রিয় পাঠকসমাজের সুবিধার্থে সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে শিরোনাম যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে, পুস্তিকা দুটির অনুবাদ করতে গিয়ে কতক ভাই-বন্ধুর সাহায্য পেয়েছি, কিছু ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে ঋণী করেছেন। তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শুকরিয়া ও দোয়া। মূল সংকলকের জন্যও প্রকাশ করছি প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা।

কাজটি যত্নসহ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছি। তবে মানবিক দুর্বলতার বিষয়টি আমি অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং, সুহৃদ পাঠকের নিকট যে-কোনো ধরনের ত্রুটি গোচরীভূত হলে বা কোনো ধরনের পরামর্শ থাকলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ থাকল।

আল্লাহর নিকট আমাদের কামনা, তিনি যেন আমাদের এই কর্ম কবুল করেন এবং একে আমাদের জন্য নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশপ্রাপ্তির ওসিলা বানিয়ে দেন।

সাকিব, নেত্রকোনা
২১/৮/২০২০খ্রি.

সংকলকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাদের নফসের অনিষ্ট ও মন্দ কাজসমূহ থেকে বাঁচতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। পক্ষান্তরে যার ক্ষেত্রে তিনি ভ্রষ্টতার স্রোতকে আপন গতিতে ছেড়ে দেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সৃষ্টির সকল অংশের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এ ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় হজরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসুল। আল্লাহ তার ওপর এবং তার পরিজন ও সাথিসঙ্গীদের ওপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

প্রিয় পাঠক,
প্রতিটি পিতামাতার মনেই সৎ বংশধর লাভের বাসনা থাকে। যেমন, কুরআনে উল্লেখিত হজরত যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ায় আমরা ব্যাপারটির ইঙ্গিত পাই,

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সুসন্তান দান করুন।
নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শুনে থাকেন।" (সুরা আলে ইমরান: ৩৮)

তো, এই বইটি সে-ক্ষেত্রে আপনার প্রথম পদক্ষেপ, অর্থাৎ বংশধরদের নামাজের ওপর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। এটি পড়ার সময় আপনার মনে হবে, আপনি বাচ্চাদের বাবা-মা ও মুরব্বিবেষ্টিত বড়ো এক গল্পের আসরে বসে আছেন, যেখানে তারা সকলে আপনাকে একের-পর-এক তাদের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে যাচ্ছেন। অতএব, আপনি সেগুলো মনের কানে শুনুন, তারপর আপন ঘর সুসজ্জিত করে তোলার অভিপ্রায়ে সেগুলো থেকে নিজের পছন্দমতো উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাই করে নিন। আশা করি, এর প্রয়োগে আপনার সন্তান হয়ে উঠবে নামাজি আর সেই সৌরভে আপনার ঘর হয়ে উঠবে ইমানের সুবাসে সুরভিত।

আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, "নিজেদের সন্তানকে নামাজের আদেশ করা অভিভাবকদের কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশের দরুন এটি তাদের ওপর অবশ্যকর্তব্য। যেমন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

> কোনো মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এই সুযোগ নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর তাদের জন্য সেটি পালন করা বা না করার ইচ্ছাধিকার থেকে যাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে, সে স্পষ্টভাবেই ভ্রষ্ট হয়েছে। (সুরা আহযাব: ৩৬)

ইমাম নববি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, (নামাজের) ব্যাপারে আদেশ করা অভিভাবকের ওপর অপরিহার্য হোক তিনি পিতা, দাদা অথবা প্রশাসনিকভাবে দায়িত্বশীল।' আর এটি কেবল পুরুষদেরই দায়িত্ব নয়, মায়েরাও এ ক্ষেত্রে সমান অংশীদার।[১]

শুকরিয়াজ্ঞাপন

কৃতজ্ঞতার তোড়া আমার সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা ও নেয়ামতের বর্ষণে সিক্ত করে তোলা মহান রবের প্রতি, যাঁর উদারতা ও দানে আমি কানায়-কানায় পূর্ণ। আমার এ শুকরিয়া তাঁর জন্য, যাঁর দয়ায় আমার কাজগুলো হয়ে ওঠে সহজ, যাঁর ইশারায় পরিচালিত হয় পুরো জগৎ, সর্বোপরি যিনি দান ও দয়ার অভিধায় অভিষিক্ত, আমার এবং সমস্ত কিছুর রব যিনি, যিনি ছাড়া কোনো উপযুক্ত উপাস্য নেই, যাঁর বান্দারা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দ্বীন পালন করে—যদিও তাঁর অবাধ্য কাফেররা তা অপছন্দ করে।

দ্বিতীয়ত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করেনি, সে আল্লাহর প্রতিও শুকরিয়া আদায় করেনি।"[২] অতএব, এই হাদিসের ওপর আমলকরত আমি তাদের প্রতিও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যারা এই বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; বিশেষত আমার সে-সমস্ত দ্বীনি বোনের প্রতি, যারা আমাকে উপকারী অভিজ্ঞতা সরবরাহের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন এর মাধ্যমে আমি বেশ উদ্দীপনা লাভ করি।তাদের সহযোগিতার ফলেই আমার জন্য দ্রুত সময়ে রচনাটির উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাই তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

---

১. ড. ফজলে ইলাহি রচিত *আল-ইহতিসাব আলাল আতফাল*: ২০।

২. *জামে তিরমিজি*: ১৯৫৫—দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ—। (অনুবাদক)

এ ছাড়া আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যারা সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করানোর সফল অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ইনশাআল্লাহ, এর দ্বারা মুসলিম ভাই-বোনেরা অব্যাহতভাবে উপকৃত হতে থাকবেন এবং জীবনে ও মরণে অবিরতভাবে আপনারা সেই নেকি লাভ করে যাবেন।

সত্য বলতে, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমি একটি বাক্যের চেয়ে সুন্দর কিছু বলার সামর্থ্যই রাখি না! তাই যারাই তাদের অভিজ্ঞতা সরবরাহ বা সহযোগিতার মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাদের প্রতি আল্লাহর নিকট দোয়া করে আমি শুধু এটুকুই বলব, "জাযাকাল্লাহু খাইরান" (আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণকর প্রতিদানে প্লাবিত করুন)!

কিছু কথা

● আমরা এখানে সন্তানকে নামাজে অভ্যস্ত করার জন্য তাত্ত্বিক কথাবার্তার সাথে প্রায়োগিক দিকসমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করব। আলোচনাটি একদম নতুন ধারার, ইতিপূর্বে এর ওপর গুরুত্ব দিয়ে কিছু লেখা হয়নি। অবশ্য নামাজের অন্যান্য বিষয় তথা এর গুরুত্ব, তা আদায়ের মৌলিক বিষয়াদি (রুকন ও শর্ত), নষ্ট (ফাসেদ) হওয়ার কারণাবলি ইত্যাদি নিয়ে আলোচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। সে-কারণেই আলোচ্য বিষয়ে মানুষের সফল অভিজ্ঞতাসমূহ একত্র করে একটি রচনা সংকলনের চিন্তা আসে আমার মধ্যে।

আমি এখানে নামাজের মাসয়ালা সংক্রান্ত তেমন কোনো আলোচনা আনিনি। সে-জন্য বিস্তৃত বিবরণসহ ফিকহের কিতাবাদি বিদ্যমান রয়েছে। তবে আলোচনা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং কর্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য কিছু স্থানে অল্প পরিমাণ শরয়ি আলোচনাও এনেছি।

● ঘরের সদস্য বা অন্যদের সঙ্গে গল্পের সময় পঠিত অভিজ্ঞতাগুলো তাদের বলুন অথবা পড়ে শোনান। আশা করি এতে বেশ উপকার হবে। সম্ভব হলে আপনার ক্লাসে, লেকচারে ঘটনাগুলো প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করুন। এতে মুসলিম ঘরগুলো সংশোধন হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা পাবে। কারণ, ঘরের কর্তারা সন্তানদের নামাজের তদারকিতে অবহেলা প্রদর্শনের ফলে ঘরগুলো আজ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তাই মুসলিম পরিবারগুলো আজ নেকসন্তান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আশা করি, বইটির এরূপ বাস্তবিক প্রয়োগের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব হবে।

● আলোচনায় আমি যখন সন্তান শব্দটি উল্লেখ করব, তা দ্বারা ছেলে-মেয়ে উভয়কেই বোঝাব; শুধু ছেলে সন্তান ভাবলে ভুল হবে।

● অভিজ্ঞতা সংগ্রহ: মানুষের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে আমি কিছু প্রশ্নসংবলিত কাগজ বিতরণ করি। যাদের সাত বা তারচেয়ে বেশি বয়সি সন্তান আছে, তাদের কাছে জানতে চাই—

"আপনার সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কী? কীভাবে আপনি সফল হলেন? তাদের আপনি ছোটোকালেই অভ্যাস করিয়েছেন, না আরো পরে? সে-ক্ষেত্রে আপনার পদ্ধতি কী ছিল?"

এরপর আমার কাছে মা-বাবা, ভাই-বোন ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের থেকে প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতাপত্র এসে জমা হতে থাকে। ফলে আমার আনন্দ, উৎসাহ অনেকগুণে বেড়ে যায়।

কিন্তু এরমধ্যে কতক অভিজ্ঞতাপত্র সামনে নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। কারণ, সেখানে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছিলাম ঘটনার দ্বিরুক্তি, অস্পষ্টতা, আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, অগোছালো উপস্থাপনা, অতি সংক্ষেপায়নের ফলে সৃষ্ট দুর্বোধ্যতা, কিছু অভিজ্ঞতা একদমই শিক্ষামূলক না হওয়া ইত্যাদি। তবে কিছু অভিজ্ঞতা খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, যেগুলো বুঝতে আমার তেমন বেগ পেতে হয়নি।

এ সমস্ত কারণে কতক অভিজ্ঞতা আমার নতুন করে সাজাতে হয়েছে আর কতক স্থানে সম্পাদনার কলম চালাতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল ঘটনা ও বর্ণনাকারীগণের তুলে-ধরতে-চাওয়া বিষয়টি যেন পাঠকের কাছে সুন্দর, সাবলীলভাবে ফুটে ওঠে, সেদিকেও লক্ষ রেখেছি।

কখনো আলোচনা সুস্পষ্ট করতে গিয়ে আমাকে দুই-এক কথা জুড়ে দিতে হয়েছে। আবার কখনো মনে হয়েছে, বর্ণনাকারীর বিস্মৃতি বা সংক্ষেপায়নের ফলে স্বাভাবিক কিছু বিষয় ছুটে গেছে, তখন আমি চিন্তাভাবনাপূর্বক সে-স্থান পূর্ণ করে দিয়েছি। এ ছাড়া, রচনাটি আকর্ষণীয় করে তুলতে আমি একে পারস্পরিক আলাপচারিতার উপস্থাপনায় সাজিয়েছি, কারণ এর হৃদয়ছোঁয়া ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি।

তবে ঘটনাগুলোতে আমি একটি বিষয় খেয়াল করি। তা হলো, ঘুরেফিরে সবগুলো একইরকম কয়েকটি ধারার অন্তর্ভুক্ত। তাই দ্বিরুক্তি বর্জনের জন্য আমি কিছু অভিজ্ঞতা এড়িয়ে যাই। তবে উপকারিতার দিকে লক্ষ রেখে দ্বিরুক্তি সত্ত্বেও কিছু অভিজ্ঞতা গ্রন্থবদ্ধ করে নিয়েছি। কেননা, সেগুলোতে নামাজের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার পদ্ধতি, ভয় দেখানোর পন্থা, নামাজ ত্যাগকারীর প্রতি ধমকি, ইসলামে নামাজের গুরুত্ব, কাফের আর মুসলিমের মাঝে নামাজই হচ্ছে পার্থক্যরেখা, অভিভাবক কর্তৃক পুরস্কার প্রদান, সাহস দেওয়া ও প্রশংসা করা এরকম নানান শিক্ষামূলক বিষয় ছিল।

সত্য বলতে, এরূপ সম্পাদনার হস্তসম্প্রসারণ ব্যতীত আমার উপায় ছিল না। আগত ঘটনা-অভিজ্ঞতাগুলোতে ঠিক-বেঠিকের সংমিশ্রণ থাকায় আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রিয় পাঠকের সামনে এর পরিশোধিত রূপটি তুলে ধরা।

দয়ার আঁধার আল্লাহর নিকট আমার কামনা, তিনি যেন তাঁর তওফিক ও দয়ায় আমাকে সিক্ত করেন এবং এই পুস্তিকার মাধ্যমে প্রতিটি মুসলিমের উপকার সাধন করেন।

হানা সনি
রিয়াদ, ১৪২৬হি.
hana_s3@hotmail.com

সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আপনার নিয়ত যেমন হবে:

- আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আদেশ পালন।
- অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়।
- নামাজ যেন সন্তানদের অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।
- আদেশ, ঘুম থেকে জাগ্রতকরণ, শাস্তিদান, পুরস্কার প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে একজন মুসলিমকে নামাজের মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করার সওয়াব লাভ।
- একটি নেক সন্তান লাভ, যে মৃত্যুর পরেও দোয়ায় আপনার জন্য হাত তুলবে।
- একজন মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর নেকি অর্জন। আর সেই মানুষটি কে?! সে যে আপনারই কলিজার টুকরো ছেলে, আপনারই প্রাণপ্রিয় মেয়ে!
- কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশের পুণ্য লাভ। হজরত আবু মাসউদ আনসারি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে কল্যাণকর কাজের পথনির্দেশ করবে, তার জন্যও কার্যসম্পাদনকারীর ন্যায় সওয়াব রয়েছে।"[৩]
- আপনার সন্তান যেন জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

যারা ইমান এনেছে আর তাদের বংশধরও তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের পরস্পরকে মিলিত করে দেবো। আমি তাদের আমল থেকে কিছুই হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ-নিজ কর্মের জন্য দায়বদ্ধ।[৪]

৩. *সহিহ মুসলিম*: ১৮৯৩।
৪ (সুরা তুর: ২১)

• পাকাপোক্ত ইবাদতকারী, আল্লাহর সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং দ্বীন ও উম্মাহর উপকার সাধনকারী একটি মুমিন প্রজন্ম তৈরি করে যাওয়ার সওয়াব লাভ।

• নবিগণের অনুসরণ। যেমন, আল্লাহ তায়ালা হজরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে কুরআনে বলেন,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"সে তার পরিজনকে নামাজ আর জাকাতের আদেশ করতো। তার প্রতিপালকের নিকট সে ছিল পছন্দনীয় ব্যক্তি।" (সুরা মারয়াম: ৫৫)

অতএব, নবিগণের মতো একটি আমল করে আপনি বিশাল নেকির অধিকারী হবেন।

"জনৈক সালাফ বলেন, যে ব্যক্তি আমলের সওয়াব সম্বন্ধে জানে না, আমল করা তার জন্য সর্বদাই কষ্টসাধ্য হবে।"

ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাগুলো সত্যিই বেদনাদায়ক

ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেদনাদায়ক হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি নামাজের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়া। কিন্তু একজন মানুষ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেই সে ব্যর্থ হয়ে গেছে বলা যায় না; বরং ওটা কেবল তখনই বলা যায়, যখন সে হতোদ্যম হয়ে পালিয়ে যায় প্রচেষ্টার ময়দান থেকে। অতএব, আমরা হতাশা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনায় আত্মনিয়োগ করি। তারপর এই সৎ ব্যক্তিবর্গের সফল অভিজ্ঞতাগুলো সামনে রেখে নিজের জন্য আলোক সংগ্রহে সচেষ্ট হই। আমাদের চোখের পর্দায় এখনই যেন ভেসে উঠবে, তারা নিজেদের সন্তানকে নামাজের ওপর গড়ে তুলতে কীরূপ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন!

সঠিক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগতি ও উদ্দীপনা লাভের ক্ষেত্রে তাদের কথাগুলো আপনার খুব কাজে আসবে বলে আশা করি। আপনি যখন দেখবেন যে অসংখ্য মানুষ ঠিক আপনারই মতো আপন সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তারা আপনার চেয়ে অনেক বেশি সচেষ্ট, তখন হয়তো আপনার নিজের কাজের প্রতি আফসোস জাগবে। ফলে আপনি চূড়ান্ত চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়ে উঠবেন।

প্রিয় ভাই, সুপ্রিয় বোন, আপনার সন্তানকে আপনার হৃদয়ের মনিকোঠায় ঠাঁই দিন। রক্ষা করুন তাদের জাহান্নামের আগুন এবং রবের গজব থেকে! তাদের চোখগুলোর যখন আপনার চোখদ্বয়ের সাথে সম্মিলন ঘটে, সেগুলো তখন নীরব ভাষায় বলে ওঠে—আমানত, আমরা তোমার নিকট আমানত! আমাদের নষ্ট করো না!

অতএব হে প্রিয়, অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যান। কারণ, সন্তান তো শুধু জীবনের শোভাবর্ধকই নয়, বরং এরা আপনার জন্য পরীক্ষাও! কিন্তু আপনি তাতে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন তো? তবে কোমর বাঁধার আগে মনে রাখুন, পথের শুরুটা হয় বড়ো কণ্টকাকীর্ণ, তারপর আসে তার মসৃণতা।

অন্যদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বলতে কী বোঝায়?

• তাদের মেধার মাধ্যমে নিজের মেধাকে সক্রিয় করে তোলা। তাদের পোড়-খাওয়া জীবনযাত্রার সাথে নিজের আনাড়ি জীবনতরির যোগসূত্র স্থাপন করা।

• এর মাধ্যমে সুপ্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠা।

• ভুল পদক্ষেপ গ্রহণকারীদের পথ পরিহার করতে পারা। সাফল্যমণ্ডিত অভিজ্ঞতার বাহনে চড়ে অল্প সময়ে ও স্বল্প প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে সক্ষম হওয়া।

• অভিজ্ঞতা বিষয়টি আসলে কী? তা হচ্ছে, সফলতার নাগাল পেতে জীবন-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের চেষ্টাপ্রচেষ্টা। হ্যাঁ, কেউ হয়তো তার নাগাল পায়, আবার কারো জন্য তা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। কিন্তু অবিসংবাদিত বিষয় হচ্ছে, ব্যর্থতার পথ মাড়িয়েই সে একদিন সফলতার সিঁড়ি খুঁজে পায়।

• সফল অভিজ্ঞতা হচ্ছে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী জীবন্ত এক চালিকাশক্তি, যার মাধ্যমে শ্রমসাধ্য কর্মের প্রতিও সাহসী হয়ে ওঠা যায়। তখন দক্ষভাবে ব্যর্থতার প্রাচীর ডিঙিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে আপন লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

আমি সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রেখেছি। সর্বদা তাঁর সাহায্য কামনা করেছি। তাদের অন্তরের সুস্থতা ও সংশোধনের জন্য প্রচুর পরিমাণে দোয়া করেছি।

তাদের ছোটোকালে প্রায় সাত বৎসর বয়স থেকেই আমি তাদের নামাজের তাগিদ দিতাম, নামাজিদের প্রাপ্য সওয়াবের কথা বলে তাদের উৎসাহিত করতাম। তাদের সামনে আমি জান্নাত আর তার নেয়ামতসমূহের কথা বলতাম, সময়-সুযোগ হলেই তাদের জান্নাত আর দুনিয়ার নেয়ামতের মাঝে তুলনা করে দেখাতাম। কেননা, এতে তাদের অন্তর চিরস্থায়ী নেয়ামতের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং তা অর্জনের জন্য তারা আমলের প্রতি যত্নবান হবে।

নামাজের সময় যদি আমি তাদের খেলা করতে দেখতাম, তখন তাদের সরাসরি আদেশ না দিয়ে শান্তভাবে বলতাম—এসো এসো, আমরা আল্লাহর সওয়াব পেতে নামাজ পড়ে নিই। বলো তো দেখি, কে আগে আল্লাহর খুশি নিয়ে নিতে চাও? যে নামাজ পড়ে, আল্লাহ কিন্তু তাকে ভালোবাসেন আর জান্নাতে তাকে এগুলো থেকেও অনেক বেশি সুন্দর খেলনা দিয়ে খেলতে দেবেন।

এখন আপনাদেরকে আমার বারো বছর বয়সি মেয়ের একটি ঘটনা শোনাচ্ছি। তার বয়স তখন নয় বছর; আমি তাকে অন্যান্য ফরজে অভ্যাস করানোর পর এবার ফজরের নামাজে উঠানোর অভ্যাস করাচ্ছি। সে তখন আমাকে বলতো—আম্মু, আমাকে ফজরের সময় ডেকে দিয়ো। কিন্তু আমি যখন তাকে জাগাতাম, তখন সে ঘুমানোর জন্য কাঁদতে শুরু করতো, তাই আমিও তাকে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু সকালে যখন তাকে ফজরের ঘটনা অবগত করতাম, তখন সে বলতো—আমি তো কিছুই বলতে পারি না! এরপর আবার বলতো—তাহলে কাল তুমি আমাকে ডেকে দিয়ো।

পরের দিন যখন আমি আবার তাকে জাগাতাম আর সেও আগের দিনের মতো করতো, তখন আমি তার ঘুম ছাড়ানোর চেষ্টা করতাম, তাকে কোলে করে পানির কাছে নিয়ে গিয়ে আলতোভাবে মুখ ধুয়ে দিতাম। কিন্তু তখন সে আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে আবার কাঁদতে শুরু করতো। আমি তখন বলতাম—মামনি,

তুমিই তো আমাকে বলেছ তোমাকে জাগিয়ে দিতে! এরপর আমি তাকে ছেড়ে দিতাম আর সেও বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু সকাল হলে ঠিকই সে আমাকে আবার যত অভিযোগ-অনুযোগ শোনাতে শুরু করতো যে—কেন আমি তাকে ডেকে দিলাম না! আমিও তাকে ফজরের ঘটনা শোনাতাম, কিন্তু তার সেই একই উত্তর—আমি তো কিছু বলতেই পারি না!
তবে আমি হতাশ হইনি; বরং প্রতিদিনই তাকে জাগাতে থাকলাম আর তারও সেই একই প্রতিক্রিয়া চলতে থাকল। তবে আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে সে ফজরের নামাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

আমার মেয়ে একরাতে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে যায়। তখন আমি ফোনে কথা বলার সময় একটু জোরে আওয়াজ হয়ে যাওয়ায় সে জেগে ওঠে। এরপর সে তারচেয়েও বেশ বড়ো বিছানার শীতের চাদর টেনে নিয়ে নামাজ পড়ার জন্য মাথা ঢাকতে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে তো আমি আনন্দে অভিভূত! আমি তখন বললাম—ঘুমিয়ে পড়ো আম্মু, এখনো নামাজের সময় হয়নি।

অতএব সকল বাবা-মায়ের প্রতি আমার আহ্বান হচ্ছে, আপনারা ছোটোকালেই আপন সন্তানদের দ্বীনি বিষয়াদি শিখিয়ে দিন। এতে তারাও আপনাদের সাহায্য করতে পারবে, প্রয়োজনের সময় স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে এবং মৃত্যুর পর দোয়ায় দু-হাত তুলতে সক্ষম হবে।

মুহাম্মাদ বিন মুবারক সুরি রহ. বলেন, সাঈদ বিন আব্দুল আযিয তানুখি এর যদি নামাজের জামাত ছুটে যেত, তবে তিনি কেঁদে ফেলতেন।

দু'আ: অনন্যোপায়ের অবলম্বন

আমার ছেলে দ্বীনের ব্যাপারে কখনোই মনোযোগী ছিল না, সব সময় জাগতিক বিষয়াদি নিয়ে মত্ত থাকত। আমি তাকে নামাজের কথা মনে করিয়ে দিলে বা ঘুম থেকে জাগ্রত করলে সে একেবারেই গুরুত্ব দিতো না। এতে আমি অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়ি। এর সমাধানের জন্য মনের যত ভয় নিয়ে নামাজ ও দোয়ার মাধ্যমে আমি আল্লাহর শরণাপন্ন হই। আমি দোয়া কবুলের সময়গুলোতে, বিশেষ করে রাতের শেষভাগে একান্ত মনে দোয়া করতে শুরু করি—তিনি যেন নামাজকে আমার সন্তানের চোখের শীতলতা বানিয়ে দেন। আমি বারবার এই দোয়া করতাম,

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার রব, আপনি আমাকে এবং আমার বংশধর থেকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বান্দা তৈরি করুন। হে আমাদের রব, আপনি আমার দোয়া কবুল করুন। (সুরা ইবরাহিম: ৪০)

আমি আন্তরিক মনে বিনয়ের সাথে, কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে কাতর হয়ে দোয়া করতাম। বিশেষ করে আমার যখন মনে হতো যে নামাজের ব্যাপারে অবজ্ঞা, অবহেলা প্রদর্শনের ফলে আমার সন্তান জাহান্নামে পৌঁছে গেছে!

এভাবে দু-বছর চলে গেল। আমিও আমার অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা আল্লাহর কাছে বলে যেতে থাকলাম। পরিশেষে এমন একদিন এলো, যখন আমি আমার পুত্রকে নামাজের জায়নামাজে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম! শুধু তাই নয়, বরং সে নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হয়ে ওঠে এবং অন্যদেরও এর গুরুত্ব বোঝাতে শুরু করে! আমি তখন মহান আল্লাহর দরবারে প্রশংসা আদায় করি আর সত্যসত্যই অনুধাবন করতে পারি, তিনি অনন্যোপায়দের ডাক শুনেন, তাদের ডাকে সাড়া দেন।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আমার সফলতার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটি হচ্ছে একনিষ্ঠভাবে অবিরত আল্লাহর নিকট দোয়ার আমল।

জামাতে নামাজের ব্যাপারে শিথিলতা ত্যাগ

আমি আমার ছেলেদের দশ থেকে বারো বছরের ভেতরেই মসজিদে পাঠানো শুরু করি। মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে আমি তাদের অনবরত চাপ দিতাম। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ শিথিলতা দেখাইনি—হোক প্রচণ্ড শীতের দিন, এমনকি ছুটির দিন বা ঘুমের চাপকেও প্রশ্রয় দেইনি।[৫]

আমি এখনো এভাবে তাদের দেখাশোনা করে যাচ্ছি। তারা বিভিন্ন বয়সি—কারো বারো, কারো আঠারো, আবার কারো বিশ বছর। আমি তাদের ঘুম থেকে জাগানোর ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি। যেমন: ডাক দিয়ে তাদের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি; অল্প করে পানির ছিটা দেই; তাদের মসজিদের পথে বের না করে নিজে নামাজে দাঁড়াই না; এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো তালবাহানা কানে নিই না। কিন্তু এ সকল কিছুর পূর্বে আমি যে কাজটি করি, তা হচ্ছে—অবিরাম আল্লাহর নিকট দোয়া।

এগুলো সবই আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তাদের মৃত পিতা (রাহিমাহুল্লাহ) অবশ্য আমার মতো করেননি। বস্তুত, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহরই প্রাপ্য।

প্রশ্ন: আমার সন্তানদের বয়স নয় থেকে তেরো বছরের মাঝে। আমি তাদের সব সময়ই নামাজের জন্য জাগিয়ে তুলি। ফজরের সময় বেশ ঠান্ডা থাকে, তাই এক খতিব সাহেব তাদের মসজিদে পাঠানোর ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করে বললেন, এই অবুঝগুলোকে কষ্ট দেওয়ার কারণে আপনি গুনাহগার হবেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছি, আসলেই কি আমি গুনাহগার হবো? (জাযাকাল্লাহু খাইরান ওয়া আফিয়াতান।)

উত্তর: এ ক্ষেত্রে আপনি উত্তম কাজই করেছেন। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন আপনাকে উক্ত কাজের জন্য সওয়াব প্রদান করেন এবং অন্যান্য পিতা-মাতার জন্য আপনাকে উত্তম আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেন।

আপনাকে যিনি গুনাহ্ হওয়ার ভয় দেখিয়েছেন, তিনি সঠিক বলেননি (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক বিষয়ের অনুসরণ ও সৎকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদানের তওফিক দান করুন)। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ এবং হাকেম

---

৫. শীতের দিনে ও প্রচণ্ড গরমেও সন্তানকে স্কুলে পাঠানো কিংবা ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে পিতা-মাতারা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, অথচ নামাজের জন্য জাগানোর ক্ষেত্রে তারা এগুলোকেই অজুহাত হিসেবে পেশ করেন; এই ঘটনাটি তাদের অবহেলা প্রদর্শনের প্রমাণ।

(রাহিমাহুমুল্লাহ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"তোমরা তোমাদের সাত বছর বয়সি সন্তানদের নামাজের ব্যাপারে আদেশ করো। দশ বছর বয়সে এ জন্য তাদের প্রহার করো এবং পরস্পরের বিছানা আলাদা করে দাও।"[৬]

লক্ষ করুন, এই হাদিসে শীত বা অন্য কোনো সময়কে পৃথক করা হয়নি।[৭]

৬. *সুনানে আবু দাউদ:* ৪৯৬—দারুল কিবলা, প্রথম সংস্করণ—। (অনুবাদক)
৭. *ফাতাওয়াল লাজনাতুদ দায়িমাহ:* ১/২৭-২৮।

ছোট মানুষের এতকিছু করার কি আছে?

মানুষ অবহেলা করে বলে:

ছোটো মানুষের আবার নামাজ, ইবাদত কীসের!

ছোটো মানুষেরও টাখনুর ওপর কাপড় পরতে হয়!
ছোটো মানুষেরও পর্দা লাগে!
ছোটো মানুষেরও রোজা আছে!
ছোটো মানুষের এতো ঢিলেঢালা কাপড় পরার কী আছে!

এসবের প্রতি-উত্তরে আমরা বলি, ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) আবিল হাওরা থেকে বর্ণনা করেন,

আমি হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আর্জি জানালাম, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে কিছু বলুন। তিনি বললেন, আমি একদিন জাকাতের একটি খেজুর হাতে নিয়ে মুখে পুরে ফেললাম। তখন তিনি আমার লালাসহই তা মুখ থেকে বের করে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: জনাব, এই ছোটো বাচ্চা একটি খেজুর নিয়ে ফেলায় আপনি এমন প্রতিক্রিয়া দেখালেন কেন? তিনি বললেন, আমি আর আমার পরিজনদের জন্য জাকাতের সম্পদ হালাল নয়।[৮]

লক্ষ করুন, অল্প বয়সের অজুহাতে কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এটি বরদাশত করে তাকে হারামে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেননি। ওলামায়ে কেরাম এই হাদিসের আলোকে বলেন, বড়োরা যেমন হারাম থেকে বেঁচে থাকে, ছোটোদেরও তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

ছোটোবেলাতেই বাচ্চাদের নামাজের তাগিদ দেওয়ার রহস্য হচ্ছে, এতে তাদের নামাজের অভ্যাস হয়ে যাবে, বিধায় বড়ো হলে নামাজের ক্ষেত্রে যেসব কষ্টক্লেশ অনুভব হতে পারে, সেগুলো তাদের নিকট হালকা মনে হবে।

ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন,

---

৮. *মুসনাদে আহমাদ*: ১৭২৭।

আমি একদিন আমার খালা মাইমুনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে রাত্রিযাপন করি। তখন তাঁকে বললাম, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামাজে দাঁড়াবেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দেবেন। এরপর তিনি যখন নামাজে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর বামপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। তখন তিনি আমার হাত ধরে টান দিয়ে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। আমার মধ্যে যখন তন্দ্রা চলে এলো, তখন তিনি আমার কানের লতিতে ধরেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি তখন এগারো রাকাত নামাজ আদায় করেন।[৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন আর আমার ডান কান মলতে থাকলেন।[১০]

এই হাদিসে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিন্তু ইবনে আব্বাসকে ছোটো হওয়ার কারণে তার ভুলের ওপর ছেড়ে দেননি; বরং কানের লতি ধরে জাগিয়ে দিয়ে তার সচেতনতা ফিরিয়ে এনেছেন। দ্বিতীয় শিক্ষা হলো, আল্লাহর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথে তাহাজ্জুদ পড়তে-দাঁড়ানো এক বাচ্চার সাথে কেমন কোমল আচরণ করে দেখালেন! তিনি তার মাথায় আপন স্নেহের হাত রেখে তার কান ধরে নরম করে পাকাতে লাগলেন। বস্তুত, এতে অনেক কোমলতা প্রকাশ পায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক হলো, নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাজ পড়া অবস্থায়ও ইবনে আব্বাসের প্রতি নজর রাখতে ভুলেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বাচ্চাদের কর্মকাণ্ড গুরুত্ব সহকারে নেওয়া আর তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা অতি জরুরি বিষয়।

অতএব পিতা-মাতাদের কর্তব্য হচ্ছে, ইবাদতের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ভুলও গুরত্ব সহকারে দেখে তা সংশোধন করে দেওয়া। শুধু নিজেদের ইবাদতে ব্যস্ত থেকে তাদের অবহেলা করা উচিত নয়।[১১]

---

৯. *সহিহ মুসলিম*: ৭৬৩।

১০. *সহিহ মুসলিম*: ৭৬৩।

১১. *আল-ইহতিসাবু আলাল-আতফাল*: ৪৮।

সকলে মিলে নামাজ সংক্রান্ত আলোচনা শোনা

যে ব্যক্তি নামাজ প্রতিষ্ঠা করল, সে যেন স্বয়ং দ্বীনই প্রতিষ্ঠা করল; আর যে তা নষ্ট করল, সেও যেন গোটা দ্বীনই ধ্বংস করল—আমি এ দুটি বিষয় অন্তর থেকে বিশ্বাস করি। নামাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা এবং সবরের সঙ্গে অবিরত এর তদারকি করে যাওয়া।

আমি আমার মেয়েদের আর ছোটো ছেলেকে বাচ্চাকাল থেকেই নিয়মিত কুরআন হিফজ করানো এবং তাদের প্রাত্যহিক জিকির করানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেই। আল্লাহর রহমতে আমার মেয়েরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আর ছেলে পড়াশোনা করছে মাধ্যমিকে। আমি আর তার বাবা ছোটোকাল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত তার তদারকি করে যাচ্ছি। তার বাবা যখন নামাজের জন্য বের হতেন, তখন বলতেন—বাবা এদিকে এসো, নামাজে যাই।

তিনি তখন এই দোয়াও করতেন,

الله يصلحك... الله يهديك...,

الله ينور بصيرتك

(আল্লাহ তোমাকে সংশোধন করুন, তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিন।)

নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে তিনি (শিক্ষামূলক) অডিও-ভিডিও দ্বারাও সাহায্য নিয়েছেন। জুমার খুতবায় যদি নামাজের ব্যাপারে আলোচনা হতো, তাহলে আমি সকলকে একসাথে নিয়ে বসে বয়ান শুনতাম। তবে এ সমস্ত বিষয়ের সর্বাগ্রে যা দরকার, তা হচ্ছে—দোয়া, দোয়া আর দোয়া!

أَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ ذُرِّيَّتِيْ (হে আল্লাহ, আমার বংশধরদের আপনি সংশোধন করে দেন)—এই দোয়াটি আমি সেজদায়, দোয়া কুনুতে কখনোই পড়তে ভুলি না। তাদের কোনো কাজ যখন আমাকে আনন্দিত অথবা ব্যথিত করে, তখনো আমি এটি পড়ি।

'নামাজি হতে তোমার এতদিন বাকি'

কয়েক বছর আগে আমার প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। আমি মনে-মনে ভাবতাম, কী করে আমি তাকে নামাজের ওপর বড়ো করতে পারি? ব্যাপারটি নিয়ে আমি খুব চিন্তা করতাম। তাই আমার ছেলে আব্দুল্লাহর বয়স যখন পাঁচ, তখন থেকেই তাকে আমি এই কথাগুলো শিখিয়ে দেই—নামাজ হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। মনে রেখো, তাবুর খুঁটি যদি ভেঙে যায়, তাহলে পুরো তাবুটিই ভেতরের মানুষের ওপর ভেঙে পড়ে।

তার সাত বছর পূর্ণ হওয়ার আগে থেকেই আমি তাকে বলতাম—অতি শীঘ্রই তোমার জীবনে আনন্দঘন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় আসবে; তুমি বড়ো হয়ে যাবে আর তখন নামাজি মানুষ হয়ে উঠবে। সময়ে সময়ে আমি তাকে বলতাম—ইনশাআল্লাহ, নামাজি হতে তোমার আর এতদিন বাকি আছে।

এরপর আব্দুল্লাহর যখন নামাজে আদেশ করার মতো বয়স হলো, তখন আমি তাকে বোঝালাম যে নামাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কথা বলার ক্ষেত্রে সব সময়ই আমি তাকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিস শুনিয়ে বোঝাতাম—যদিও সে ওগুলোর কিছুই বুঝত না, কিন্তু আমি নামাজের ব্যাপারটি তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে চাচ্ছিলাম।

আমি চেষ্টা করতাম, তার বাবা যেন তাকে মসজিদে নিয়ে যান, তাহলে সে এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আব্দুল্লাহও তার বাবার সাথে মসজিদে যেতে চাইতো। নামাজের জন্য আমি তাকে অজু করে নিতে বলতাম আর সেও আমার কথা শুনে তা পালন করতো।

আমি সব সময় তাকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিতাম, এ ব্যাপারে তার মনে সাহস জোগাতাম। আমি আমার বান্ধবীদের সামনে তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে তার কাজের প্রশংসা করতাম। এ ছাড়া, তার ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে আমি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করি।

আমি তাকে অবিচল নামাজি লোকদের গল্প শোনাতাম, নামাজিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের পুরস্কারের কথা বলতাম, ভালো করে তাকে জান্নাতের নেয়ামত আর জাহান্নামের শাস্তির কথা বোঝাতাম। আমি তাকে এগুলো সহজভাবে বলতে চেষ্টা করতাম, যেন সে তা বুঝতে পারে এবং বিষয়গুলো তার মস্তিষ্কে বসে যায়।

সে যখন ফজরের নামাজ আদায় করতো, তখন আমি তাকে বলতাম—ফজরের নামাজ বা অন্য যে-কোনো ধরনের ইবাদত করলে চেহারায় আলোর আভা সৃষ্টি হয়। তখন সে চেহারা দেখতে দৌড়ে আয়নার দিকে চলে যেতো![১২]

আমি তার দৈনন্দিন জীবনের বিষয়াদির সঙ্গে নামাজের সম্পর্ক জুড়ে দিতে চেষ্টা করেছি। যেমন, সে যদি কখনো ঝগড়া করে আঘাত পেত, পড়ে গিয়ে বা অন্য কোনোভাবে ব্যথা পেত, তার কোনো জিনিস হারিয়ে যেত, তখন আমি তাকে বলতাম—তুমি অমুক দিন ওই ফরজ নামাজটি ছেড়ে দিয়েছিলে, সম্ভবত সে-জন্যই আজ এমনটি হয়েছে! এতে তাকে নামাজে অভ্যস্ত করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত, আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

তোমরা যে-সমস্ত মুসিবতের শিকার হও, সেগুলো তোমাদেরই
কৃতকর্মের ফল আর অনেক কিছুই তিনি মাফ করে দেন।[১৩]

তদ্রূপ, তার আনন্দঘন মুহূর্তগুলোও আমি কাজে লাগাতাম। তখন তাকে বলতাম—আল্লাহর ইবাদত করার কারণে, বিশেষত নামাজ আদায়ের জন্যই তুমি এটি পেয়েছ। কারণ, নামাজি মানুষকে আল্লাহ সব ধরনের হাসিখুশি আর কল্যাণ দান করে থাকেন।

এভাবেই আমি ক্ষণে-ক্ষণে তাকে নামাজি বানিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেছি। সব সময়ই আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ পালন করতে প্রয়াস চালিয়েছি। কারণ, তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ করো। দশ বছর বয়সে এ জন্য তাদের প্রহার করো।"[১৪]

আব্দুল্লাহ এখনো দশ বছরে পা দেয়নি। তবে আমি আশা করি, তাকে নামাজের জন্য আমার প্রহারের প্রয়োজন হবে না। সত্য বলতে, যে-সকল পিতা-মাতা ইখলাসের সাথে তাদের বাচ্চাদের ছোটো থেকেই নামাজের অভ্যাস করিয়ে থাকেন, আল্লাহর রহমতে আমি মনে করি না যে পরবর্তী সময়ে তাদের কখনো প্রহারের প্রয়োজন হতে পারে।

---

১২. রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নামাজ হচ্ছে আলোক।" (সহিহ মুসলিম: ২২৩—দারে তাইয়িবা—)। অর্থাৎ, এর দ্বারা অন্তরে আলো সৃষ্টি হয়। আর অন্তর যখন আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন চেহারাতেও আলোঝলমল ভাব সৃষ্টি হয় এবং হৃদয়ের জানালাগুলো উন্মুক্ত হয়ে যায়।

১৩ (সুরা শুরা: ৩০)

১৪. *সুনানে আবু দাউদ*: ৪৯০।

আব্দুল্লাহকে নামাজের অভ্যাস করানোর জন্য আমি আরো বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। যেমন, তাকে একটি রেকর্ডিং ডিভাইস আর খালি ক্যাসেট কিনে দেই। সে নামাজের ওয়াক্ত ছাড়াই সেখানে নামাজ পড়ে রেকর্ড করতে ফেলত। এ ছাড়া আমি তাকে বলতাম—তুমি একটু খুতবা দাও তো শুনি। তখন সে হ্যাঙ্গারের কাছে গিয়ে (সম্ভবত সেখানে মাইক্রোফোনটি থাকত) ভাষণ দেওয়া শুরু করতো। আমি তার জন্য ছোটো একটি আবা, একটি শিমাগ[১৫] আর একটি মিসওয়াক কিনে দেই। সে তার বাবার সাথে জুমার দিন মসজিদে যাওয়ার কারণে আমার বেশ লাভ হয়েছিল। কারণ, সে তখন এগুলো স্বচক্ষে দেখতে পেত।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

তুমি তোমার পরিজনকে নামাজের আদেশ করো এবং নিজেও তাতে অবিচল থাকো। আমি তোমাকে রিজিকের দায়িত্ব দিচ্ছি না, আমিই তোমাকে তা প্রদান করি। বস্তুত, শুভ পরিণতি আল্লাহ্ভীরুতার মধ্যেই।"[১৬]

আমি এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তাফিকির করে দেখলাম, এতে একটি গূঢ় রহস্য এবং শ্রমসাধ্য কাজের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, নামাজের আদেশ দ্বারা দ্রুত ফল লাভের আশা করা ভুল। বরং অত্যধিক পরিমাণে এর আদেশ করে যেতে হবে, এমনকি দিনে কয়েকবার করে তা পালন করতে হবে। এরপর আবার তার ওপর অবিরত, অবিচল থেকে ফলের আশায় অপেক্ষা করতে হবে।

আমার প্রথম সন্তান আব্দুল্লাহর পরের সন্তানগুলোকে নামাজে অভ্যস্ত করতে পূর্বের মতো বেগ পেতে হয়নি। কারণ, আব্দুল্লাহ তা শিখে ফেলায় সে-ই আমার কাজে সহযোগী হয়ে উঠেছিল। সে তার ভাইদের নামাজ শেখাতে শুরু করে। সে তাদের নিয়ে ঘরে নামাজ পড়ত। আমি তাকে যেভাবে শিখিয়েছি, সেও তার ভাইদের ঠিক সেভাবেই শেখাতে চেষ্টা করতো—যদিও তার বাচ্চাসুলভ স্বভাবের কারণে তা পূর্ণরূপে হতো না। কিন্তু এটি ছিল তার উত্তম একপ্রচেষ্টা, যা আমার অন্তরে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি করে। আমি তখন উপলব্ধি করি, অনবরত

---

১৫. আবা ও শিমাগ একধরনের পোশাক। (অনুবাদক)

১৬ (সুরা তহা: ১৩২)

তাকে নামাজের আদেশ করে যাওয়া আজ এই উত্তম রূপ লাভ করে আমার সামনে উপস্থিত। বস্তুত, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

আল্লাহর নিকট দোয়া করার বিশেষ তাৎপর্য ও শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। আমি কতবার যে আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করেছি—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার রব, আপনি আমাকে এবং আমার বংশধর থেকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বান্দা তৈরি করুন। হে আমাদের রব, আপনি আমার দোয়া কবুল করুন। (সুরা ইবরাহিম: ৪০)

বাইতুল্লাহর তওয়াফ আর দোয়া কবুলের মুহূর্তগুলোতে আমি আয়াতটি দ্বারা দোয়া করতাম। অবশেষে আল্লাহ আমাকে এই দৃশ্য দেখালেন যে—আমার পিচ্চি মেয়েটি অধিকাংশ সময় আমার বলা-কওয়া ছাড়াই একা-একা জায়নামাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে ফেলছে, যদিও তার এটি করতে বেশ কষ্ট হতো। বস্তুত, আল্লাহই তার জন্য তা করা সহজ করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় এটি তাঁর অনুগ্রহ ও তওফিকের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

"সে বিশ্বাসও করেনি আর নামাজও আদায় করেনি। শুধু অবিশ্বাস আর পৃষ্ঠপ্রদর্শনই করে গেছে।" (সুরা কিয়ামাহ: ৩১-৩২)

'দোয়া করেছি, বদদোয়া দেইনি'

আমার স্বামী আমাদের ছেলে সন্তানদের নামাজ পড়ার বিষয়টি দেখাশোনা করতেন। তাদের নামাজি করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়ী। তাদেরকে তিনি মসজিদের জামাত ছেড়ে ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি দিতেন না।

কিন্তু তাদের বয়স যখন প্রায় সতেরোতে পৌঁছে, তখন কোনো কারণে আমরা তাদের পিতা থেকে দূরবর্তী একশহরে স্থানান্তরিত হই। তাদের এ বয়সটি ছিল বেশ আশঙ্কাজনক সময়। অনেক সময় তারা নামাজে ফাঁকি দিতো।

এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর শরণাপন্ন হলাম, তাদের সংশোধনের জন্য তাঁর নিকট দোয়ায় মনোনিবেশ করলাম। পাশাপাশি, নামাজের ব্যাপারে শিথিলতা ত্যাগের জন্য অনবরত তাদের বোঝাতে থাকলাম। তাদের সামনে আমি চোখে পানি নিয়ে আসতাম, যেন তা দেখে তারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের কল্যাণ কামনায় আমার দরদ বুঝতে পারে। আমি সব সময় তাদের জন্য দোয়া করে গেছি, কখনো তাদের ওপর বদদোয়া দেইনি।

তারা সত্যি-সত্যি মসজিদে যেত কি না, সে ব্যাপারেও আমি খেয়াল রেখেছি। এই শঙ্কাজনক সময় পার হয়ে তারা নিজেরাই নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত আমি এভাবেই তাদের তদারককারী ছিলাম। তবে এখনো আমি তাদের নামাজের ব্যাপারে আদেশ-উপদেশ দিয়ে থাকি। এমনকি আমি কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রাত্রিযাপন করি না এই ভয়ে যে—জাগানোর অভাবে বুঝি তাদের নামাজ ছুটে যায়!

তবে আমি আমার মেয়েদের ছোটো থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্তই নামাজের সাথে অন্যরকম একভালোবাসার ওপর গড়ে তুলতে পেরেছি। আমি ছিলাম যেন তাদের বোনেরই মতো। আমি জাগতিক বিষয়াদি থেকে তাদের অন্তর পবিত্র রাখতে চেষ্টা করেছি—যেমন মার্কেট, পার্কে ঘোরাফেরা ইত্যাদি। তা ছাড়া, ঘরে আলাদা কাজের মানুষ না থাকায় তারাই ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকত। এ কারণে তাদের জন্য আল্লাহর ইবাদতে দৃঢ়পদ হওয়া এবং সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা সহজ ব্যাপার ছিল। তারা আমার কথা মেনে চলত, আমার খুশি-সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দিতো। বস্তুত, এ হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামত, যে কারণে আমি তাঁর দরবারে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

স্বামীর-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টা

আমার মেয়ের নামাজের অভ্যাসের পেছনে শুধু আমারই অবদান নয়, বরং এ ক্ষেত্রে তার বাবাও আমাকে সাহায্য করেছেন। তার সাত বছর হওয়ার পর থেকে আমি তাকে বলতে শুরু করি—আশা করি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর সেখানে তুমি সব ধরনের মিষ্টি, সুস্বাদু খাবার পাবে। আল্লাহ আমাদের মুসলমান আর হজরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত বানিয়েছেন, এ জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। আর আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের নামাজ

পড়তে হবে, যেন তিনিও আমাদের ভালোবাসেন আর তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করতে দেন। আমি নিয়মিত তাকে এগুলো বলতাম।

তার বয়স তখনো দশের কম। নামাজের সময় যদি সে অন্য কিছুতে লিপ্ত থাকতো, তবে আমি তার প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হতাম; কিন্তু তখন আমি ধৈর্যধারণ করে মনে-মনে বলতাম, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন। এখন তার বয়স দশ। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যাঁর সাহায্যে তাকে আমি নামাজের অভ্যাস করাতে পেরেছি। এরপর আমার স্বামীর অবদানের কথাও আমি ভুলব না, এ ব্যাপারে তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

: আমরা যদি একদিনের নামাজের সময় হিসেব করি, তবে অন্যান্য সময়ের তুলনায় তার পরিমাণ কতটুকু হবে?

: তা একদিনের ৬.২৫% সময়। আর এমন একটি শ্রেষ্ঠ ও মাহাত্ম্যপূর্ণ আমলের মোকাবিলায় এটি খুব কম পরিমাণ সময়ই বটে। অন্যদিকে, মানুষের জাগতিক জীবন এবং তার কবর ও হাশরে এর সুপ্রভাব তো রয়েছেই।

'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন'

সৎ আমলসমূহ হচ্ছে এমন এক চালিকাশক্তি, যার দীপ্তি ও উপকারিতা কখনো নিঃশেষ হয় না। আমি আমার সন্তানদের নামাজি ব্যক্তির প্রাপ্য বিশাল সওয়াবের কথা শুনিয়ে নিয়মিত উপদেশ-উৎসাহ দিতাম। ফলে আমার উদ্দেশ্য সহজভাবে সফলতার মুখ দেখেছিল।

খুব ছোটো বয়স থেকেই আমি তাদের নামাজের অভ্যাস করাতে শুরু করি। নামাজের সময় আমার দুই বছরের ছেলে যখন আমার পাশে এসে বসত, তখন আমি তাকে ধমক দিতাম না, বরং তার জন্য জায়গা করে দিতাম কিংবা তার জন্যও আলাদা একটি জায়নামাজ বিছিয়ে দিতাম।

কখনো-বা আমি তাকে আদর করে ডেকে বলতাম—আমার সাথে নামাজ পড়বে তুমি? বা এভাবে বলতাম—এসো, আমরা নামাজ পড়ি। এতে কখনো সে আমার সাথে এসে নামাজ পড়ত, আবার কখনো দৌড়ে তার খেলনার দিকে চলে যেত। আমিও তাকে জোর করতাম না, কারণ এখনো সে একদম পিচ্চি।

আমার একটি বাচ্চা এখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। আমি লক্ষ করলাম, তার শিক্ষক যেদিন তাকে নামাজের নিয়ম শেখালেন, শুদ্ধভাবে নামাজ শেখার আনন্দে সেদিন সে প্রফুল্লচিত্তে বাড়িতে ফিরে এলো। তারপর বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন শুরু করলাম। আমি তাকে জোর আওয়াজে নামাজ পড়তে বললাম। এতে তার নামাজের কেরাত বা আমলে যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে আমি তা ঠিক করে দিতে পারব।

এরপর আমি যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে সে অজু ও তা ভঙ্গের কারণ এবং নামাজ আদায় ও তা নষ্ট হওয়ার কারণগুলো আয়ত্ব করে নিয়েছে, তখন আমি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ তথা তার নামাজের তদারকি শুরু করলাম। আমি যদি তাকে নামাজ পড়তে দেখতাম, তবে আল্লাহর প্রশংসা করতাম; আর যদি না দেখতাম, তবে তাকে জিজ্ঞেস করতাম—নামাজ পড়েছ তুমি?

এভাবে আমি অবিরত তার খেয়াল রাখতে লাগলাম আর তাকে নামাজের বিশাল নেকি ও সওয়াবের কথা শোনাতে থাকলাম। তাকে এও বলতাম—আল্লাহ কিন্তু তোমার সব অবস্থায়ই জানেন আর সব সময়ই তোমাকে দেখছেন। কারণ, তিনি বলেছেন,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللهَ يَرَى

সে কি জানে না যে আল্লাহ তাকে দেখছেন! (সুরা আলাক: ১৪)

এতে সে আর আমার ভয়ে বা আমাকে খুশি করতে নামাজ পড়বে না, বরং তার নামাজ হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

তবে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে আমি তাকে এত কঠিনভাবে পাকড়াও করতাম না যে সে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়। সে যদি নামাজ না পড়া সত্ত্বেও আমার ভয়ে মিথ্যা বলে ফেলে, তবে তো তার মাধ্যমে মারাত্মক একটি কবিরা গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেল!

আমি তাকে বলতাম, কেয়ামতের দিন বান্দার হিসেব শুরু হবে নামাজের মাধ্যমে। তখন যদি নামাজের হিসেব ঠিকঠাক দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য আমলের হিসেবও ঠিকমতো দেওয়া যাবে; কিন্তু এখানে যদি গন্ডগোল পাকে, তবে অন্যগুলোতেও সমস্যা জড়িয়ে ধরবে। এর মাধ্যমে তার মধ্যে নামাজের প্রতি যত্ন বাড়িয়ে তোলাই ছিল আমার লক্ষ্য। কারণ, সে নামাজ নষ্ট করার মাধ্যমে তার অন্য আমলগুলোও নষ্ট হতে দিতে পারে না।

আমি লক্ষ করলাম, বাচ্চারা যখন নামাজ শেখার বয়স সাত নম্বর বছরটিতে পা দেয়, কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ দ্বারা তাদের প্রলুব্ধ করা যায় না। কারণ, তখন তারা প্রতিদিনই সুস্বাদু খাদ্যখাবার খায়, খেলনা দ্বারা তাদের ঘর ভরতি হয়ে থাকে। তাই আমি এ সময়টিতে জাগতিক বিষয়াদি থেকে উর্ধ্বের এক বিষয়ের শরণাপন্ন হই, যার মাধ্যমে সে আখেরাতমুখী হয়ে উঠবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তার সমস্ত আমল সম্পাদন করবে। অর্থাৎ, নেক আমলের প্রতি উৎসাহ। বস্তুত, এটি আশ্চর্যজনক এক প্রভাবক, যার প্রভাব আপনি তার বিভিন্ন কাজকর্মে ফুটে উঠতে দেখবেন। যেমন, আমি যদি আমার মেয়েকে বলতাম—রাস্তা থেকে এটি উঠিয়ে ফেলো, আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দেবেন; তখন সে দৌড়ে গিয়ে তা পালন করতো। কিন্তু আমি যখন বলতাম—এটা তুলো, ঘরটাকে একটু পরিষ্কার-পরিপাটি দেখাবে; তখন সে আমাকে বলতো—এটা তো আমি ফেলিনি, অমুক ফেলেছে; তাকেই তুলতে বলো। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রভাব লক্ষ করুন!

মোটকথা, শিশুরা হচ্ছে একটি চারাগাছের মতো—আমরা যদি ছোটো থেকেই তাদের খেয়াল রাখি, যত্ন করি, তবে তারা সফল হবে। কিন্তু তখন যদি তাদের যাচ্ছেতাইভাবে ছেড়ে দেই, তবে তারা নষ্ট হয়ে যাবে আর পরবর্তী সময়ে তাদের সংশোধন হওয়াও কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অথচ আমরা তখন মানুষের কাছে তাদের সংশোধের জন্য পথপদ্ধতি খুঁজে বেড়াই!!

প্রশ্ন: সন্তানকে নামাজের আদেশ করার ব্যাপারটি কখন শুরু হবে? ছয় বছর শেষ হয়ে সাত নম্বর বছরে প্রবেশ করলে, নাকি সাত পূর্ণ হওয়ার পর?

উত্তর: সন্তান যখন সাত বছর বয়স পূর্ণ করবে, তখনই তার পিতা-মাতা নামাজের অভ্যাস করানোর জন্য তাকে আদেশ করতে শুরু করবেন। ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও হাকেম (রাহিমাহুমুল্লাহ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছরের সময় নামাজের আদেশ করো। দশ বছরের সময় এ-জন্য তাদের প্রহার করো এবং পরস্পরের বিছানা পৃথক করে দাও।" এর দ্বারা বোঝা যায়, সাত বছর পূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য, তার শুরু নয়।[১৭]

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর *সালাত* নামক পুস্তিকায় বলেছেন, "তোমার অন্তরে যদি ইসলামের ব্যাপারে মূল্যায়ন না থাকে, তাহলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেয়ো না। আর মনে রেখো, তোমার ইসলামের মূল্যায়ন বিবেচনা করা হবে তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান নামাজের মূল্যায়ন দ্বারা।"

---

১৭. *ফাতাওয়াল লাজনাতুদ দায়িমাহ:* ৬/২৬।

সতর্কীকরণ: 'সাত বছর পূর্ণ হওয়া' বলতে বয়স গণনার ক্ষেত্রে আমাদের আঙুল যখন সাত নম্বর গিরায় পড়ে, তা উদ্দেশ্য; আট নম্বর গিরা নয়, কারণ তখন নয় নম্বর বছর শুরু হয়। (অনুবাদক)

নামাজের দীক্ষাদানে সহনশীলতা

কলিংবেলের অনবরত শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললাম। তামাটে বর্ণের দুজন মানুষ আমার সামনে দাঁড়ানো—দুজনের চেহারাতেই যুদ্ধফেরত সৈনিকের ভাব। আব্দুল্লাহর কান দুটো তার বাবার হাতের মলা খেয়ে একদম লাল হয়ে আছে। আমাকে তার সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে সে কেঁদে-কেঁদে বলল—আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো মসজিদে যাব না! তার আব্বু ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে বসে পত্রিকায় মুখ গুঁজে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

আব্দুল্লাহর বয়স এখন চার। জুমার জন্য তার আব্বুই তাকে নিয়ে আগে-আগে মসজিদে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এটুকু বাচ্চার জন্য একনাগাড়ে দু-ঘণ্টা চুপচাপ শান্ত হয়ে বসে থাকা তো চাট্টিখানি কথা নয়! আর ইমাম সাহেব মিম্বরে ওঠার পর যখন সমস্ত মানুষ কুরআন পাঠ, জিকির ইত্যাদি থেকে নিবৃত হয়ে চুপ করে বসে গেল, তখন তো ব্যাপারটি তার কাছে আরো বেশি আশ্চর্যের মনে হলো। তার আব্বু তখন মুখের বদলে হাতের ইশারায় তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছিলেন। এটি আবার একটু পর বাচ্চার সাথে প্রায় জোরজবরদস্তিতে গিয়ে ঠেকল। কখনো-বা সে তার মতো বাচ্চাদের পেয়ে আরো বেশি মেতে উঠছিল।

আমার স্বামী রাগান্বিত স্বরে আমাকে বললেন—দীর্ঘক্ষণ আমায় জ্বালাতন করার পর খতিব সাহেব যখন মিম্বরে উঠলেন, তখন সে আমাকে বলছে যে সে বাথরুমে যাবে! চিন্তা করে দেখ কেমন ঝামেলা পাকিয়েছে!
এরপর আবার তিনি বললেন—আমার সন্তানের একদম ছোটো থেকেই মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। এ সময় থেকেই যদি সে ইবাদতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে আজকালের এই ফেতনাভরতি যুগে কী করে সে নিজের দ্বীন রক্ষা করবে!!

তখন আমি সাহস করে তাঁর কথার মাঝেই বললাম—আপনি বাচ্চার সাথে এমন আচরণ করে শরিয়তের খেলাফ কাজ করেছেন। একথা শুনে তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপী দু-চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, “রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বৎসর বয়সে নামাজের আদেশ করো; দশ বছরের সময় তাদের প্রহার করো।” কিন্তু দেখুন, আপনার ছেলে হচ্ছে মাত্র চার বছরের, তো আপনি কি কাজটি ঠিক করেছেন?! আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না সে কী বলল?! সে মসজিদ ভালোবাসে না, সে দ্বিতীয়বার কখনো মসজিদে যাবে না! এবার আপনিই বলুন, আপনি কি মনে করেন যে

এভাবে কোনো শিশু ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা লালন করে বেড়ে উঠতে পারে?! আসলে, ভয় দেখিয়ে ইবাদত শেখানো তো প্রকৃত পন্থা নয়, বরং এর প্রতি কীভাবে বাচ্চার মনে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়, সেটিই আসল দীক্ষা।

তারপর আমি তাঁর কৃতকর্মের ব্যাপারে তাঁকে ভাবতে দিয়ে দ্রুত আব্দুল্লাহর কাছে চলে গেলাম। একটা ছোটো বাচ্চার সাথে তার আব্বু একজন পুরুষ মানুষের আচরণ দেখিয়েছেন, তাই আমি গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম; আমার ছেলে আল্লাহর ঘর অপছন্দ করবে, এমন ব্যাপার থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই! আমি আব্দুল্লাহকে তার খেলনাগুলো কুড়িয়ে এনে দিলাম, এতে তার মন খারাপের ভাব চলে গেল। এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম —তুমি মসজিদে সবচেয়ে সুন্দর কী জিনিস দেখেছ বলো তো দেখি? আর তখনই বের হয়ে এলো রহস্য। সে তার শিশুসুলভ ভঙ্গিতে আমাকে বলতে লাগল, খতিব সাহেব যখন মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখন তার খুব আশ্চর্য লাগছিল। সেও খুব করে চাচ্ছিল তাঁর মতো মানুষের সামনে বক্তৃতা দিতে। কিন্তু তার আব্বু তাকে চুপ থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন, আবার তার সাথে কোনো ধরনের কথাও বলছিলেন না, জবাবও দিচ্ছিলেন না। এতে সে অবাক হয়ে যায়। বস্তুত, তার জন্য এগুলো অবাক হওয়ার মতো বিষয়ই ছিল।

তার আব্বু সন্তান-প্রতিপালন ও তাদের দীক্ষাদানের ব্যাপারে সম্যক অবগত। তবে এ ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার ঘাটতি রয়েছে। তিনি অনেক তাড়াহুড়োমনা, কৌশল প্রয়োগে দুর্বল, দ্রুত রেগে যান, পরিবেশ বুঝে পদক্ষেপ নিতে পারেন না, শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় দেন না, শেখাতে গিয়ে ধৈর্যধারণের বিষয়টি আয়ত্বে রাখেন না এবং ভুলের সেতু পাড়ি দিয়ে সংশোধনের রাজ্যে প্রবেশের মতো স্বীকৃত বিষয়টিতেও তাঁর দুর্বলতা স্পষ্ট। এখন তো বলতে হয়: আহা, তিনি যেন একদম পূর্ণাঙ্গ মানুষ, নিজে জীবনে কখনো ভুল করেননি![১৮]

---

১৮. উম্মে আব্দুল্লাহ গাযযি: *মাজাল্লাতুল উসরাহ্*: সংখ্যা: ১০৬, পৃষ্ঠা: ৭২। (সংক্ষেপিত)

মায়ের দোয়া ও তার প্রচেষ্টা

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"হে আমার রব, আপনি আমাকে এবং আমার বংশধর থেকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বান্দা তৈরি করুন। হে আমাদের রব, আপনি আমার দোয়া কবুল করুন।" (সুরা ইবরাহিম: ৪০)

এ হচ্ছে হজরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়া; আমিও আল্লাহর কাছে এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে দোয়া করেছি।

আমি আমার সন্তানদের নামাজের আদেশের সময় প্রতিবার আমার নিয়ত বিশুদ্ধ করে নিতাম, বিশেষ করে ফজরের নামাজ আর মসজিদে যাওয়ার আদেশের সময়। কারণ, এর বদলায় আমার জন্য নেকি রয়েছে এবং এটি আল্লাহর প্রিয় হতে পারার মতো একটি ইবাদত বলেও গণ্য।

আমি আর তাদের আব্বু মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, আমরা মসজিদের পাশে বাসা নেবো। এতে তাদের পিতার অনুপস্থিতির সময়ও তাদের জন্য মসজিদে যাতায়াত অব্যাহত রাখা সহজ হবে। এ ছাড়া আমাদের ঘরে হারাম বিনোদনমাধ্যমের কোনো উপকরণ না থাকাও আমার দায়িত্ব আদায়ের জন্য বেশ সহায়ক হয়েছিল।

আমি আমার সন্তানদের অন্তরে নামাজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রবিষ্ট করাতে চেষ্টা করেছি। পড়াশোনা, বাড়ির কাজ ইত্যাদিসহ দুনিয়ার যত বড়ো বিষয়ই হোক না কেন, সবকিছুর ওপর নামাজের প্রাধান্যদানের অভ্যাস করিয়েছি।

আমার পিচ্চি বড়ো ছেলেটি একবার বায়না ধরল, তাকে একটি লাউডস্পিকার কিনে দিতে হবে। সে তার আব্বুর সাথে ঘন-ঘন মসজিদে যাওয়ার ফলে ইমাম সাহেব তাকে মসজিদের লাউডস্পিকার নিয়ে খেলতে দিতেন, যে-জন্য এর প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এরপর তাকে সেটি কিনে দেওয়া হয়, যা তার নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সে তার ভাইদের নিয়ে ইমাম সাহেবদের মতো ঘরে নামাজের ইমামতি করতো, বিশেষ করে সে মক্কা-মদিনার ইমামগণের অনুকরণ করতো। একসময় দেখা গেল, এটিই আমার সন্তানদের প্রিয় খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা ওটা নিয়ে খেলা করার সময় আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতাম—যাও, অজু করে এসে ভালো করে নামাজ পড়ো, নাহয় তোমাদের নামাজ কিন্তু নিছক খেলাধুলা হয়ে যাবে; ওভাবে ভালো করে নামাজ পড়লে আল্লাহ তোমাদের সওয়াব দেবেন।

তাদের নামাজের সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসা তৈরির পেছনে এই লাউডস্পিকারটির প্রভাব আমার কাছে স্পষ্ট। আলহামদুলিল্লাহ, তারা বিভিন্ন বয়সি হওয়া সত্ত্বেও গত পনের বছর যাবৎ এটিই তাদের খেলার বস্তু।

আমার অল্প বয়সি সন্তানদের যখন আমি ফজরের নামাজের জন্য বের হয়ে যেতে দেখি, তখন আমার মুখ দিয়ে বারবার এই দোয়া বের হয়ে আসে—হে আল্লাহ, আপনি নামাজকে তাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন।

অবশেষে আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে, আমার সন্তানদের এবং সমস্ত মুসলিম সন্তানকে তাঁর দ্বীন ও তাঁর নবির সুন্নতের ওপর অটল-অবিচল রাখেন। আমিন।

হজরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এক ওয়াক্ত নামাজও ছেড়ে দিলো, তখনই আল্লাহ আর তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।"

আজানের সাথে বাচ্চাদের সম্পর্ক গড়ে তোলা

সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আমার ধরাবাঁধা কোনো সময় ছিল না। তারা যখন একদম ছোটো, তখনই আমি তাদের শিখিয়ে দেই, মুয়াজ্জিন সাহেব যখন আজান দেবেন, তখন তার সাথে-সাথে তার মতো পুরো আজান বলতে হবে। তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য আমি একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করি—আজানের সময় যে সবার আগে কথা বন্ধ করে জবাব দিতে পারতো, আমি তার জন্য জাগতিক, মানসিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করি। এ ছাড়া তারা যখন আমাকে জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে প্রশ্ন করতো, তখন আমি সেগুলোর উত্তর দিতাম নামাজঘনিষ্ঠভাবে—যে নামাজ পড়বে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত; যে তা আদায় করবে না, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম! হ্যাঁ, জাহান্নাম!!

তাদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমি উৎসাহদান, ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের আবেগ জাগ্রত করার প্রতি খেয়াল রাখতাম। আমরা গাড়িতে থাকাকালে নামাজের সময় হয়ে গেলে তাদের আব্বু যখন গাড়ি থামিয়ে মসজিদে যেতেন, তখন আমি একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতাম। আমি সে-সময় তাদের নামাজের মাহাত্ম্য আর তা ওয়াক্তমতো আদায়ের গুরুত্ব বোঝাতাম, তাদের মননে প্রবেশ করাতাম যে নামাজকে বিলম্বিত করা হলে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। তাদের সাত বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমি এভাবেই তাদের প্রস্তুত করে তুলি। এরপর তারা যখন সেই বয়স পূর্ণ করে, তখন আমি তাদের নামাজ পড়ানোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক আদেশের দিকে মনোনিবেশ করি। আমি তাদের সওয়াবের প্রতি উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে আদেশ করতাম। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে যদি শিথিলতা দেখা যেত, তবে তাদের পছন্দনীয় বিষয়াবলি থেকে বঞ্চিত করার পথ অবলম্বন করতাম।

আমাদের আত্মীয়স্বজনের বাচ্চারা যখন একত্রিত হতো, তখন আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করে বলতাম—তোমরা সকলে মিলে জামাতে নামাজ পড় তো দেখি; একজন ইমামতি করো, তার পেছনে দাঁড়াবে ছেলেরা আর তাদের পেছনে দাঁড়াবে মেয়েরা। তাদের নামাজ পড়া শেষ হলে আমি তাদের কাজের প্রশংসা করতাম। বস্তুত, সংঘবদ্ধ হয়ে এভাবে প্রায়োগিক আমলের বেশ প্রভাব রয়েছে, যার মাধ্যমে শুধু আমার সন্তানরাই নয়, বরং আত্মীয়স্বজনের সকল ছেলে-মেয়েই এর ফায়দা লাভ করবে।

বাচ্চাদের সাথে ইমানি আলোচনা

আমার মেয়েটি বড়ো একরোখা গোছের, ব্যক্তিত্ববোধ বেশ টনটনে, খুব পাকা। সে এখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। আমি তাকে নামাজের গুরুত্ব আর তা ত্যাগের বিধানসংবলিত ক্যাসেট এনে দিলাম। সেখানে নামাজ ত্যাগকারীদের মন্দতর পরিণতি নিয়ে বেশ কিছু প্রভাবদায়ক ঘটনা ছিল। তার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রথমে আমি তাকে সেখান থেকে একটি ঘটনা শোনাই। সে ঘটনাটি খুব পছন্দ করে আর নিজ থেকেই আমাকে আরো ঘটনা শোনাতে বলে। তখন আমি বলি—ক্যাসেটটি নাও, এখানে আরো অনেক ঘটনা আছে। এরপর সে তা শুনতে শুরু করে।

তাকে আমি বিভিন্নভাবে তৈরি করেছি। সময়ে-সময়ে আমি তার সাথে ইমানের ছয়টি স্তম্ভ[১৯] নিয়ে আলাপ করতাম, তাকে কেয়ামতের ছোটো-বড়ো আলামতগুলোর কথা বলতাম। প্রত্যেকবার আলাপ-আলোচনার সময়ই আমি তাকে নতুন কিছু শোনানোর চেষ্টা করতাম। কারণ, এরূপ আলোচনার মাধ্যমে তার ইমানি শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য, বিশেষ করে নামাজ আদায় করা তার জন্য সহজ হয়ে উঠবে।

কখনো-কখনো সে নামাজ শেষ করলে আমি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতাম,

: আল্লাহর আনুগত্যের ছাপে তোমাকে কতই-না সুন্দর লাগছে!

: নামাজ শরহে সদর[২০] করে আর তোমাকে সর্বদা সুখী রাখবে।

: যে নামাজ পড়ে, আল্লাহ তার পড়াশোনাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা দান করেন।

: আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি, কারণ তুমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছ। এর মাধ্যমে তুমি তোমার আব্বু-আম্মুকেও খুশি করেছ।

---

১৯. অর্থাৎ, আমাদের সুপরিচিত ইমানে মুফাসসালে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। তথা, আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবাদি, সকল নবি-রাসুল, কেয়ামত দিবস, তকদিরের ভালো-মন্দের বিধায়ক আল্লাহ তায়ালা এবং পুনরুত্থানের ওপর ইমান রাখা। তবে এখানে ছয়টি বিষয় বলা দ্বারা কেয়ামত দিবস ও পুনরুত্থানকে একইসাথে বুঝানো হয়েছে, সুতরাং কোনো ধরনের বৈপরীত্ব নেই। (অনুবাদক)

২০. এর মানে হচ্ছে বক্ষ উন্মোচন, তথা অন্তর খুলে দেওয়া, হৃদয় প্রশস্ত করে দেওয়া। তখন মানবহৃদয় ইলম, হিকমত এবং উত্তম চরিত্র ধারণে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। অন্তরে তখন এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে তা জগতে বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনাবলি উপলব্ধি, সৃষ্টজীবের প্রতি চিন্তাভাবনা করে শিক্ষাগ্রহণ, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধিবিধান থেকে উপকার লাভ ইত্যাদিতে সক্ষম হয়ে ওঠে। আর শরহে সদরের বিপরীতে আসে 'দাইকে কলব' বা 'কাসাওয়াতে কলব'—অর্থাৎ, অন্তর সংকীর্ণ বা শক্ত হয়ে যাওয়া।

বিস্তারিত জানার জন্য *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*-সহ অন্যান্য তাফসিরগ্রন্থে সুরা যুমারের ২২ নম্বর আয়াত, সুরা ইনশিরাহের প্রথম আয়াত ইত্যাদির তাফসির দেখতে পারেন। (অনুবাদক)

: নামাজ আদায়ের ফলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর তিনি যখন তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করবেন, তখন তোমার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, বান্ধবী, শিক্ষিকা সকল মানুষই তোমাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করবে।

নামাজ ছেড়ে দেওয়া বা তাতে শিথিলতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমি তাকে ভয় দেখাতাম। কখনো এমন হলে আমি তার সাথে উদ্বেগ, দরদ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের পাশাপাশি আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখিয়ে কথা বলতাম। যেমন—নামাজ ছেড়ে দিলে চেহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। কাজে আল্লাহর তওফিক পাওয়া যায় না। এ কারণে কখনো-কখনো সহজ কাজগুলোও তোমার কাছে কঠিন মনে হবে।

তার নামাজ ছুটে যাওয়া যদি মারাত্মক আকার ধারণ করতো, তখন আমি কঠিন রূপ ধারণ করে তাকে বলতাম—নামাজত্যাগী একটি দুরাচারী মানুষ আমাদের সাথে একই ঘরে থাকবে-খাবে আর আমরা তার আরাম-আয়েশের জন্য খেটে যাব, তা কখনো হতে পারে না!! আবার কখনো আবেগি বাক্য ব্যবহার করতাম। যেমন,

: তোমার সাথে কখনো আমার কথা নেই।

: তোমার পাশে আমি জীবনেও বসব না।

: তোমাকে আর কখনোই আমি জড়িয়ে ধরব না।

: যে নামাজ পড়ে না, তার প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা নেই।

তার সাথে আমার কথা যখন শেষ পর্যায়ে চলে আসত, তখন আমাদের ওপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ, তাঁর প্রচুর নেয়ামত, কীভাবে তিনি আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন, কী করে আমরা তাঁর দেওয়া সুস্থতা, খাবার, ঘুম, অক্সিজেন ইত্যাদি উপভোগ করে চলেছি, সেগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতাম। যেমন আমি তাকে বলতাম,

: তুমি আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাচ্ছ। তিনিই তোমার জন্য খাদ্য গলধকরণ আর এর স্বাদ আস্বাদন সহজ করে দিয়েছেন। তুমি সর্বদা তাঁর দেওয়া অক্সিজেনের মাধ্যমে নিশ্বাস নিচ্ছ। তাঁর জমিনের ওপর ঘুরে বেরাচ্ছ। তাহলে কী করে তুমি তাঁর শুকরিয়া আদায় আর ইবাদত না করে থাকতে পারো?! কোন অধিকারে এটি সম্ভব, বলো?!

তাকে আরো বলতাম,

: কোনো সৃষ্টজীব যদি শুধু একবার তোমার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে, তবে তুমি তাকে যখনই দেখ, তখনই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করো। তাহলে

যেই আল্লাহ তোমার জন্মের পর থেকে তোমার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে যাচ্ছেন, তাঁর প্রতি তোমার শুকরিয়ার রূপ কেমন হওয়া উচিত!

আমি যখন জানতে পারতাম যে সে কোনো ফরজ নামাজ ছেড়ে দিয়েছে বা দেরি করে আদায় করেছে, তখন আমি তাকে বলতাম—ইসতেগফার করো, ইসতেগফার করো! আর একথা বলার সময় আমার মুখাবয়বে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলতাম, যেন সে মহা এক অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে! সে তখন বলতো—দুঃখিত, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বলতাম—আল্লাহর কাছে বলো, আমার কাছে বলে লাভ নেই; তাঁর কাছে গিয়ে একান্তভাবে ক্ষমা চাও।

আমার এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আমার বদলে তার সম্পর্ক মহান আল্লাহর সাথে গড়ে উঠুক। যার ফলে সে গোপনে-গোচরে সকল অবস্থাতেই তাঁর আনুগত্য করতে পারবে, শুধু তাঁকেই ভয় করবে এবং ইখলাসের সাথে আমলে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি দিনে-দিনে তার নামাজ সুন্দর করে তুলছেন। আমি আল্লাহর নিকট আমাদের সকলের জন্য, বিশেষ করে আমার মেয়ের জন্য অবিচলতা ও দৃঢ়তার দোয়া করি। সে তার ছোটো বোনকেও কখনো-কখনো নামাজের তাগাদা দেয়। আবার কখনো নামাজের কথা বলার জন্য তাদের কামরার সামনে গেলে আমি শুনতে পাই, সে তাকে উপদেশ দিচ্ছে আর ইমানের ছয়টি স্তম্ভের কথা খুলে-খুলে বলছে! সত্য বলতে, সে তার বোনের সাথে ঠিক তা-ই করে, যেমনটি করেছিলাম আমি তার সাথে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

বাচ্চাদের মনে আল্লাহর ধ্যানখেয়াল জাগ্রত করা

আমি আর আমার স্বামী নিজেরাও নামাজ পড়তাম এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও নামাজ পড়াতাম। সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে এটিই ছিল আমাদের প্রথম পদক্ষেপ।

আমার এক ছেলে যখন দশ বছর বয়সে পৌঁছল, তখন থেকে সে তার আব্বুর সাথে মসজিদে যাওয়া শুরু করে। অবশ্য এর আগে থেকেই আমি তাকে নামাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছি। তার সামনেই অন্যদের কাছে প্রশংসা করে বলতাম—আমার ছেলে কিন্তু নামাজ পড়ে। আত্মীয়স্বজনদের সুসংবাদ দেওয়ার ঢঙে জানাতাম—কিছু দিন পর থেকে সে মসজিদে যাবে। এ ছাড়া আমি তার গোচরে-অগোচরে আল্লাহর কাছে দোয়াতেও মনোনিবেশ করি।
নামাজের সময় হলে আমার স্বামী সকল ছেলের নাম ধরে ডাক দিয়ে বলতেন—নামাজের সময় হয়েছে, নামাজের সময় হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, তখন সকলেই তাঁর পাশে ভিড় জমাতে শুরু করতো।

তবে ফজরের নামাজের ব্যাপারটি একটু কঠিন ছিল। তাই আমি তাদের জাগানোর জন্য ভালো-ভালো কথা বলতাম, আস্তে-আস্তে পিঠে হাত বোলাতাম, কোমলভাবে তাদের ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু তাদের ঘুমের প্রাবল্য যদি বেশি হতো, তবে আমি তাদের ওপর অল্পস্বল্প পানির ছিটা দিতাম, কখনো ভয় দেখিয়ে বলতাম—তোমাদের আব্বু মসজিদ থেকে এসে যদি দেখেন যে তোমরা নামাজ পড়তে দেরি করেছ, তবে কিন্তু তিনি রেগে যাবেন!

আমি সব সময় অপ্রত্যক্ষভাবে তথা নিজেকে সামনে না ধরে আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি ভালোবাসার কথা তুলে ধরে তাদের নামাজের তদারকি করতাম। কারণ, আল্লাহর সদাসম্মুখতার বিশ্বাসে তাদের গড়ে তুলতে পারলে তারা আমাদের অনুপস্থিতির সময়ও নামাজে অটল, অবিচল থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আলহামদুলিল্লাহ, আমার বড়ো ছেলের নিকট নামাজ এখন জীবনের মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তার যদি কখনো মসজিদের জামাত ছুটে যায়, আবার তার ভাই ও চাচাতো ভাইদেরও জামাত ছুটে গিয়ে থাকে, তবে সে সকলকে একত্র করে জামাতে নামাজ আদায় করে।
সে একদিন তার চাচাতো ভাইদের সাথে রাত জেগে ছিল। তখন আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কীসের নামাজ পড়ছ? সে বলল—

বিতরের নামাজ। বস্তুত সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, আমার সন্তান এখন ফরজসহ সুন্নত[২১] নামাজগুলোও নিয়মিত আদায় করছে!

সে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করছে কি না, তা জানার জন্য আমি অন্যান্য নামাজি বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতাম—সে কি মসজিদে নামাজ পড়েছে? প্রতি-উত্তরে তারা বলতো—জি, পড়েছে।

ছোটো থেকে নিয়ে তাদের বোঝার বয়স হওয়া পর্যন্ত এভাবেই আমি আর তাদের পিতা তাদের নামাজের অভ্যাস করিয়েছি। এ ক্ষেত্রে পরিবারের অন্যান্য সদস্যও আমাদের সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন।

২১. বর্ণনাকারী মায়ের মাজহাব অনুযায়ী বিতরের নামাজ সুন্নত, তবে আমাদের হানাফি মাজহাব অনুযায়ী তা ওয়াজিব, বিধায় তা ছুটে গেলে কাজা করতে হবে। (অনুবাদক)

নামাজের মালিকের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি

সর্বপ্রথম আমি আমার সন্তানদের অন্তরে স্বয়ং নামাজের আদেশদানকারীদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছি, রহমান-রহিম আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অন্তরের টান ও আকর্ষণ তৈরির পেছনে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোযোগী ছিলাম। বস্তুত এটি তেমন কোনো কঠিন কাজও নয়; বরং তাদের অন্তরে বসিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়মিত তাদের কানে এই সংক্রান্ত কথাবার্তা তুলে ধরতে হবে শুধু।

ঘুমের পূর্বে গল্প শোনানোকে আমি বাচ্চাদের অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রেম রোপণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি। যেমন, এ জন্য আমি তাদের কুরআন ও সিরাতুন নবির বিভিন্ন গল্প শোনাতাম। আমি জানতাম, আমার সন্তানরা যখন আল্লাহ্ আর তাঁর রাসুলকে ভালোবেসে ফেলবে, তখন তারা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধগুলো শুধু গ্রহণই নয়, বরং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পালন করবে; আর সেই আনুগত্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নামাজ তো রয়েছেই।

এ ক্ষেত্রে আমি অন্যান্য পদ্ধতিও অবলম্বন করেছি। যেমন,

- বিদ্যালয় খোলা থাকলে ঘুম থেকে জাগানোর সময় তাদের শিক্ষাঙ্গনের কথার বদলে বলতাম—ওঠো, নামাজ পড়তে হবে। এরপর নামাজ পড়ে তারা বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি হতো।

- কখনো যদি খেলাধুলা বা অন্য কোনো আনন্দঘন কাজে মত্ত থাকাকালে নামাজের সময় চলে আসত, তখন নামাজ আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় থেকে গেলে আমি তাদের তৃপ্তিভরে আনন্দে মত্ত থাকার সুযোগ দিতাম। এরপর ওয়াক্তমতোই তাদের দিয়ে নামাজ আদায় করিয়ে নিতাম। তারা যখন নিজেদের খেলাধুলা শেষ করতো, তখন আমি তাদের ওয়াক্তমতো নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বোঝাতাম।

- আমি সব সময় তাদের বলতাম, নামাজ হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। একথা বলার সময় ছোটো একটি কলমের ওপর একটি টিস্যু পেপার রাখতাম; এরপর কলমটি ছেড়ে দিতাম, ফলে সেটি পড়ে যেত; আর কলমটি পড়ে যাওয়ার কারণে ওপরে থাকা টিস্যুটিও লুটিয়ে পড়ত। এর মাধ্যমে আমি তাদের বোঝাতে চাইতাম, নামাজ নষ্ট করার ফলে কী করে দ্বীন ধ্বসে পড়ে।

- আমি তাদের নিয়ে কুরআন পড়তাম আর সহজ ভাষায় তাদের তাফসির শোনাতাম। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম, দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর-

স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন পায় হচ্ছে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা; আর উত্তম আমলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামাজ।

• আমি যখন তাদের কোনো গল্প শোনাতাম, তখন এমনভাবে বলতাম যে— নানান সমস্যার মধ্যে থাকলেও সফল হবে সেই ব্যক্তি, যিনি নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

• আমার কোনো সন্তান যখন আমাকে বলতো যে অমুক তার প্রিয় বন্ধু, তখন সর্বপ্রথম আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম—সে কি নামাজ পড়ে? খুব তাড়াতাড়ি করে পড়ে, না আস্তে-ধীরে? নামাজে কি সে হাসে? এরপর আমি তার অন্যান্য অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম।

সন্তানদের নামাজের আদেশ শুরু করবেন যেভাবে

১। **পরিচয়জ্ঞান:** তাদের শেখাতে হবে, একজন মুসলমানের কী-কী আকিদাবিশ্বাস রাখতে হয়। তার কোন আমলগুলো করতে হয় আর কোনগুলো ছাড়তে হয়। এটি সম্পন্ন করতে হবে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে, কোমলতার সাথে।

২। **ভীতি প্রদর্শন ও ধমকপ্রদান:** প্রয়োজনের মুহূর্তে এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যেমন, ছোটোবেলায় হজরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন জাকাতের একটি খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাচ্চা হাসানের মুখ থেকে সেটি বের করে নিয়েছিলেন।

৩। **হাতের মাধ্যমে নিষেধ:** এটিও প্রয়োজনের মূহুর্তে। উদাহরণ হিসেবে এ ক্ষেত্রেও পূর্বোল্লেখিত হজরত হাসানের উদাহরণটি প্রযোজ্য।

৪। **প্রহার করা:** এটিও প্রয়োজন দেখা দিলেই করা উচিত। নববি নির্দেশনা হচ্ছে, বাচ্চা দশ বছর বয়সে পৌঁছার পর নামাজ ছাড়লে প্রহার করা যাবে।

৫। **কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া:** ভালো মনে হলে এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।[২২]

মোটকথা, আপনি যখন বাচ্চাদের নামাজের সাথে পরিচিত করে তুলবেন এবং তা আদায়ের পদ্ধতি ও ভঙ্গ হওয়ার কারণাবলি শেখাবেন, তখন প্রয়োজনে তাদের ধমক দিতে হবে, কখনো অজু করানোর জন্য নিজে তাদের বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে, মেয়েকে নিজ হাতে ওড়না পরিয়ে দিতে হবে, ছেলের আঙুল ধরে মসজিদে নিয়ে যেতে হবে, দশ বছর হয়ে গেলে প্রয়োজনে প্রহার করতে হবে।

২২. *আল-ইহতিসাব আলাল আতফাল*: ৮৩-৮৪।

তদ্রূপ, নামাজ ছেড়ে দিলে তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়াও একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া—বিশেষ করে আবেগঘন বাচ্চা ও মেয়েদের ক্ষেত্রে।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমার সন্তানের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে।"[২৩]

পিতার পদক্ষেপ

আপনাদের সাথে আমাদের পিতার ঘটনাটি বর্ণনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি যখন মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হতেন, তখন আমরা মেয়েদের নামাজের আদেশ করতেন আর আমাদের ভাইদের ফজর ও অন্যান্য নামাজে নিজের সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর মসজিদ থেকে ফিরে এলে আবার আমাদের জিজ্ঞেস করতেন যে আমরা নামাজ পড়েছি কি না।

এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। যেমন, সময়ে-সুযোগে মাগরিবের পরে আমাদের উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন। তিনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানখেয়াল জাগ্রত করার চেষ্টা করতেন। তাই কোনো ভাই যদি বলতো—অমুক নামাজ পড়েনি, সে মিথ্যা বলছে! তখন তিনি বলতেন—আমি তো শুধু বাহির দেখে বিচার করি, অগোচরের বিষয় দেখবেন সব আল্লাহ।

রমজান মাসে তিনি তারাবির নামাজের মাঝেই ঘরে ফিরে এসে দেখতেন যে ছেলেরা মসজিদে গেছে কি না আর আমরা ঘরে ঠিকমতো নামাজ পড়ছি কি না। এরপর বাকি নামাজ আদায় করার জন্য তিনি মসজিদে ফিরে যেতেন।

যাদের দশ বছর হয়ে গেছে, প্রয়োজন হলে তাদের তিনি প্রহার করতেন। অতএব, আমাদের নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে নামাজ। তাই দেখা গেছে, বালক হওয়ার পর আমার ভাইদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করে বা অমনোযোগিতাবশত যদিও অন্য পাপ করে ফেলেছে, কিন্তু নামাজ ছাড়তে সাহস পায়নি।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের পিতার নিকট সন্তানের-পক্ষ-থেকে-পিতার-প্রাপ্য উত্তম প্রতিদান পৌঁছে দেন।

---

২৩. *সহিহ মুসলিম:* ১১৫৯।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"সে তার পরিজনকে নামাজ আর জাকাতের আদেশ করতো। তার প্রতিপালকের নিকট সে ছিল পছন্দনীয় ব্যক্তি।" (সুরা মারয়াম: ৫৫)

অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নস্বরূপ হজরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ করতেন। বস্তুত, এভাবে তিনি নিজেও পূর্ণতায় পৌঁছেন এবং অন্যদেরও পরিপূর্ণ করে তোলেন—বিশেষত তাঁর বিশেষ ব্যক্তিদের তথা তাঁর পরিবার-পরিজন। কারণ, তাঁর নিকট অন্য মানুষদের তুলনায় দ্বীনের দাওয়াত পাওয়ার অধিক হকদার ছিল তারাই। (ইবনে সাদি (রাহিমাহুল্লাহ)

বাচ্চাদের নামাজের তদারকিতে গুরুত্বপ্রদান

সপ্তাহের মাঝের দিনগুলোতে আমার স্বামী শহরের বাইরে কর্মব্যস্ত থাকেন। তবে তিনি যখন বাসায় অবস্থান করেন, তখন ফজরের নামাজটি পড়েন আমাদের নিয়ে একসাথে। বাকিগুলো বাহিরের কর্মস্থলে পড়ে নেন।

তাঁর অনুপস্থিতির কারণে আমার সন্তানদের নামাজের তদারকি আমার একাই করতে হয়েছে। তাদের সাত বছর পার হওয়ার পর থেকেই আমি আর তাদের ইচ্ছেমতো নামাজ পড়ার সুযোগ দেইনি। প্রত্যেক ওয়াক্তেই আমি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, ওয়াক্তমতো নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে কোনোরূপ তালবাহানাকে প্রশ্রয় দেইনি।

আমার সন্তানদের খেলাধুলার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। তাই নামাজের সময় হলে আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতাম। এতে দেখা গেছে, কখনো তারা আমার তাগাদা ছাড়াই নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমি যখন তাদের একা-একা নামাজে পাঠাতাম, তখন অন্য ছেলেদের সাথে রাস্তায় খেলাধুলায় মগ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের দুয়েক রাকাত নামাজ ছুটে যেত। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসাবাদের কথা মনে করে তারা জামাতে অন্তত শরিক হতো। এদিকে লক্ষ করে আমার পরামর্শ হচ্ছে, যারা মসজিদে পাঠিয়ে সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করাতে চান, সে-ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বাবার উপস্থিতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আমার ছেলেরা এখন বড়ো হয়ে গেছে। বড়োটির বয়স তেরো আর ছোটোটির বয়স এগারো। তারা নিজেদের গরজেই নামাজ পড়বে, সে-ক্ষেত্রে আমি এখন ৯০% নিশ্চিত, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি লক্ষ করেছি, নামাজের ক্ষেত্রে আমার ছোটো ছেলেটি বড়োটির থেকে তৎপর। বস্তুত, এ ক্ষেত্রে মানুষের ভেতরগত উদ্দীপনা ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি মানসিক সক্রিয়তাই মূল চালিকাশক্তি। তবে আমি কামনা করি তাদের সকলেরই যেন উন্নতি সাধন হয়।

বাচ্চা মেয়েদের নামাজ শেখানোর সহজ পদ্ধতি

আমার মেয়েদের নামাজের অভ্যাস করানোর বিষয়টি ছিল বেশ সহজ। আমি যখন নামাজ পড়ার জন্য প্রস্তুত হতাম, তখন তাদেরও ফরজ-নফল আদায় করে নিতে আদেশ করতাম। আল্লাহর রহমতে তখন থেকেই তারা ওয়াক্তমতো নামাজ পড়তে শিখে যায়। এমনকি একসময় তারা কোনোরূপ তাগিদ ব্যতীত নিজ থেকেই নামাজ আদায় করতে শুরু করে।

আমি আমার মেয়েদের আল্লাহর ভয় ও তিনি সদা প্রত্যক্ষদর্শী—এই অনুভূতির ওপর বড়ো করে তুলেছি। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমি আমার সমস্ত সন্তানকেই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর আলোকে গড়ে তুলেছি,

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

সে কি জানে না যে আল্লাহ্ তাকে দেখছেন!" (সুরা আলাক: ১৪)

তবে আমার ছেলেদের নামাজের অভ্যাস করাতে একটু বেগ পোহাতে হয়েছিল, বিশেষ করে যে-সমস্ত নামাজের সময় তাদের বাবা ঘরে থাকতেন না। তখন আমি তাদের অজু করে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ দিতাম। এরপর তাদের কেউ ফিরে এলে জিজ্ঞেস করতাম—কয় রাকাত নামাজ ছুটেছে। অবশ্য তার আসলেই নামাজের রাকাত ছুটেছে কি না, আমি তা না জেনেই প্রশ্ন করতাম। তবে বাস্তবেই কখনো প্রতিবেশী ছেলেদের সাথে খেলাধুলা বা ধীরে-ধীরে চলার কারণে তাদের এক রাকাত বা শুরুর দিকে একটু জামাত ছুটে যেত। এ ক্ষেত্রে আমি তাদের আল্লাহর ভয় দেখাতাম আর বোঝাতে চেষ্টা করতাম—আমি যখন দেখি না, তখন আল্লাহ কিন্তু তোমাদের ঠিকই দেখেন! আর যে যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ্ তাকে বিশাল প্রতিদান দেবেন!! এরপর নফল-সুন্নত নামাজ আদায়ের জন্য আমি তাদের আগে-আগে মসজিদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতাম, পাশাপাশি নামাজের পর কিছু সময় মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর জিকিরের জন্যও উদ্বুদ্ধ করতাম। নামাজের ব্যাপারে আমি কখনো তাদের পুরস্কারও দিতাম।

তাদের একজনের বয়স এখন এগারো আর অন্যজনের নয় বছর। আল্লাহর সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয়—এ দুটি পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে আল্লাহর রহমতে তাদের এখন ওয়াক্তমতো নামাজের অভ্যাস হয়ে গেছে।

বাচ্চাদের প্রহারের ধরন

অভিভাবকদের এ ক্ষেত্রে ধারাক্রম অবলম্বন করতে হবে। সাত বছর বয়সেই সন্তানকে প্রহারের মাধ্যমে নামাজ পড়াতে শুরু করা কিংবা সাতে পৌঁছার পর অবহেলা করে দশ বছরে পৌঁছতেই নামাজের জন্য প্রহারে তোড়জোড় আরম্ভ করা—দুটোর কোনোটিই কল্যাণকর নয়। বরং এ ক্ষেত্রে প্রকৃত পন্থা হচ্ছে সেই ব্যক্তির অনুসরণ, যিনি আমরা আর আমাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে স্বয়ং আমাদের চেয়েও অধিক কর্তৃত্বের অধিকারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"নবি মুমিনদের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের নিজেদের অপেক্ষা অভিবাবকত্বের অধিকারী এবং তার স্ত্রীরা হচ্ছে তাদের মাতা।" (সুরা আহযাব: ৬)

(আল্লাহ নবিজির ওপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।)

অতএব, প্রহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই তীব্র আঘাত করা যাবে না, চেহারায় মারা যাবে না, হাড় ভেঙে দেওয়ার মতো শক্ত লাঠি ব্যবহার করা যাবে না, আবার তা ব্যথাদানে অক্ষম, তেমন নরমও হবে না; বরং এসব ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রহারের ক্ষেত্রে নিতম্ব, ঊরু, পায়ের নিচের অংশ ইত্যাদি লক্ষ করে আঘাত করতে হবে, কারণ এগুলোতে এক্সিডেন্টের আশঙ্কা নেই।[২৪]

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"যে-সমস্ত নারী থেকে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদের উপদেশ দাও; তাদের বিছানা আলাদা করে দাও; তাদের প্রহার করো। এরপর তারা যদি অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যাপারে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করো না; নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোচ্চ সত্তা, মহামহিম।" (সুরা নিসা: ৩৪)

---

২৪. *আল-ইহতিসাব আলাল আতফাল*: ২৪।

অবাধ্য স্ত্রীকে শিষ্ট করে তোলার বিধানসংবলিত এই আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরগণ বলেন, "তাদের প্রহার করো"—অর্থাৎ তীব্র নয়, এমনভাবে। অতএব, প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা যেখানে তীব্র আঘাত করার সুযোগ দেননি, তাহলে একটি বাচ্চাকে প্রহারের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ কীরূপ হওয়া উচিত, তা বলার অবকাশ রাখে না।

বস্তুত এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায়, কুরআন-হাদিসের যেখানে-যেখানে প্রহারের কথা এসেছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষাদানমূলক প্রহার—শাস্তিপ্রদানমূলক প্রহার নয়। কেউ-কেউ অবশ্য বলে থাকেন—প্রহার যদি শক্তই না হয়, তবে আর মেরে কী লাভ?! এর উত্তরে আমরা বলব—অবশ্যই এর ভালো উপকারিতা রয়েছে! কারণ, এই অল্প শারীরিক ব্যথার মাধ্যমেই বাচ্চাদের মধ্যে মানসিক ভীতির সঞ্চার হয়।

প্রহারহীনভাবে নামাজে অভ্যাস করানোর উপায়

আমি মনে করি না যে আপনার কখনো বাচ্চার গায়ে হাত তোলার প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষত আপনি যদি হাদিসের ওপর আমলকরত সাত বৎসর বয়স থেকেই তাদের নামাজের আদেশ করে যান, তখন তো এর প্রশ্নই আসে না। কারণ, আপনি যেহেতু এই বয়স থেকে তাকে নামাজের আদেশ করতে থাকবেন, আবার দশ বছরের আগে তার গায়ে হাতও তোলা যাবে না, ফলে এই তিন বছরের মাঝে আপনি তাকে পাঁচ হাজার বারেরও বেশি নামাজের জন্য ডেকে ফেলেছেন! সুতরাং, যে কি না তিন বৎসর যাবৎ পাঁচ হাজারবার নামাজ পড়ে ফেলেছে, তাকে কি আবার প্রহারের মাধ্যমে নামাজ পড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে?! বস্তুত এটি বিরল বিষয়ই হবে যে—কোনো পিতা-মাতা এই হাদিসের ওপর আমল করেছেন, পরে আবার সন্তানকে নামাজের জন্য তাদের প্রহারও করতে হয়েছে।[২৫]

---

২৫. আব্দুল মালেক কাসেম রচিত *আবনাউনা ওয়াস-সলাত*।

ইতিবাচক পদ্ধতি ব্যবহার

মসজিদের মুসল্লিদের দেখে-দেখে নামাজ শেখার জন্য আমি আমার সন্তানদের দশ বছর হওয়ার পূর্বেই তাদের বাবার সঙ্গে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস করিয়েছি। এ ছাড়া বাসায়ও এ ব্যাপারে আমরা তাদের যত্ন নিয়েছি। ফলে তারা ছোটো থেকেই বুঝতে পেরেছে যে নামাজ গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

তারা নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করে, অবশ্য মাঝেমধ্যে ছুটেও যেত। এ জন্য আমি তাদের প্রহার করতাম; কিন্তু এতে ফল দাঁড়িয়েছিল বিপরীত।[২৬] একারণে তারা বিরক্তি নিয়ে নামাজে দাঁড়াতো, আবার কখনো দায়সারাভাবে তা আদায় করে নিতো। তারা যখন নিয়মিতও নামাজ পড়ত, সেটি হতো মূলত শাস্তির ভয়ে। তাই আমি আর তাদের আব্বু যখন অনুপস্থিত থাকতাম, তখন তারা ঠিকই নামাজে অবহেলা করতো। অতএব আমি ইতিবাচক পদ্ধতির আশ্রয় নিলাম। তাদের সাথে কোমল ব্যবহার আর উৎসাহ প্রদানের ভঙ্গিতে নামাজের আদেশ করতে শুরু করলাম। যে গুরুত্বের সাথে সুন্দরভাবে সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো, তাকে আমি আর্থিক পুরস্কার ও বিভিন্ন উপহার দিতাম। তবে তাদের নামাজের প্রতি গুরুত্বের অবস্থাভেদে এর মাঝে তারতম্য হতো। এ ছাড়া, আমি কখনো-কখনো তাদের সাথে নামাজের গুরুত্ব, এর দ্বারা শারীরিক উপকারিতা, অবিচলভাবে আদায়কারী ব্যক্তির প্রতিদান, ত্যাগকারীর শাস্তি ইত্যাদি নিয়েও কথা বলতাম। আলহামদুলিল্লাহ, এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমি আশাজনক ফল পেয়েছি।

কিন্তু তারা যখন কৈশোরে পৌঁছে, তখন তাদের নামাজের জন্য ঘুম থেকে জাগাতে আমার কিছুটা বেগ পোহাতে হয়, বিশেষত ফজরের নামাজের সময়। তাদের যেন ওয়াক্ত ছুটে না যায়, সে-জন্য আমি তাদের কামরায় একটি অ্যালার্মঘড়ি এনে রাখি। নামাজের সময় হলে সেখানে উচ্চারিত আজানের ধ্বনি শুনে তারা ঘুম থেকে জেগে উঠত।

---

২৬. উল্লেখ্য, প্রহার মূলত দুই প্রকারের:

এক: শাস্তিপ্রদানমূলক। সত্য বলতে, এটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তা ছাড়া এই পন্থা অবলম্বন মূলত নিষেধ।

দুই: শিষ্টাচার শিক্ষাদানমূলক। এর মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা প্রদান বা দৈহিক ক্ষতির লক্ষ্য থাকে না; বরং শুধুই শিষ্টাচার শিক্ষাদান উদ্দেশ্য থাকে। শরিয়তে কতক অবস্থায় প্রহারের যেই নির্দেশনা রয়েছে, সেটি মূলত এই প্রকারের প্রহার। বস্তুত, এর মাধ্যমেই ইতিবাচক ফল লাভ হয়ে থাকে।

আমি তাদের এই অভ্যাসও করিয়েছিলাম—যখন নামাজের সময় হবে, তখন তারাই একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আর এভাবেই আমার সন্তানদের নামাজ আদায় চলতে থাকে।

বস্তুত, সমস্ত প্রশংসাই আমাদের হেদায়েত দানকারী আল্লাহর জন্য। তিনি যদি আমাদের সঠিক পথের দিশা না দিতেন, তবে আমরা পথ পাওয়ার যোগ্য ছিলাম না।

অবহেলা ত্যাগ

সাত বছর বয়সে যখন আমি আমার সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করাতে শুরু করি, তখন বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ সত্ত্বেও আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ, শুরুর কাজ একটু কঠিনই হয়ে থাকে। আমি তাদের কাউকে বলতাম, "তুমি যখন নামাজ পড়বে, তখন তোমাকে একটি রিয়াল (মুদ্রা) দেবো" বা "এই জিনিসটি কিনে দেবো" কিংবা "অমুক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাব" ইত্যাদি। এতে তারা নামাজ পড়তে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতো।

কখনো গৃহস্থালি কাজের জন্য কিংবা অসুস্থতা বা ঘরের বাইরে যাওয়ার ফলে আমি তাদের তদারকি করতে পারতাম না। তাই আমি যখন ফিরে আসতাম, তখন তাদের জিজ্ঞেস করতাম—ছেলেরা আমার, নামাজ পড়েছ? তারা তখন উত্তর দিতো—হ্যাঁ, পড়েছি। অথচ আমি জানতাম তারা মিথ্যা বলছে।

তবে এখন, আল্লাহর রহমতে আমার অবিরত প্রচেষ্টা আমার কামনামাফিক উত্তম ফল দান করেছে। আমার ছেলের বয়স এখন আট, এখনই সে চার ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করে। আর আমার মেয়েদের বয়স দশ থেকে এগারোর মাঝে, তারাও ঠিকমতো নামাজ পড়ে। আমি সব সময়ই তাদের সকলকে নামাজের তাগাদা দিয়ে থাকি, এর গুরুত্ব বুঝিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করি।

দুঃখিত, একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। নামাজের ওয়াক্ত ঘনিয়ে এলে আমি তাদের ওপর প্রহারের পদ্ধতিও প্রয়োগ করে থাকি, যা মূলত খুব উপকারী বিবেচিত হয়েছে। কারণ, নামাজ না পড়ার জন্য আমি যখন তাদের একজনকে পিটুনি দেই, তখন অন্যরা দৌড়ে-পালিয়ে গিয়ে নামাজ পড়া শুরু করে।

পরিশেষে, আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি কথা বলতে পারি—সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে তাদের প্রতি গুরুত্বপ্রদান আর অবহেলা প্রদর্শন ত্যাগ করা অন্যতম মৌলিক বিষয়।

কঠোর কণ্ঠ

আমি একজন মা ও তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে আমার কর্তব্য হলো, নিজের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ছোটো থেকেই তাদের নামাজের অভ্যাসে গড়ে তোলা।

আমি আমার কিশোরী মেয়ের সাথে ঘটিত অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করছি। তার বয়স ছিল তখন তেরো, কিন্তু সে নামাজ পড়ত না। আমি তাকে উপদেশ দিতাম, কিন্তু তার কোনো শুভ ফল আমি পাচ্ছিলাম না। অবস্থার কেবল অবনতিই ঘটছিল। তাই আমি একদিন তাকে আমার রুমে ডেকে এনে দুজন এক ঘরে বসলাম। এরপর বললাম—তুমি কি তোমার বর্তমান অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট?! তুমি কি এতেই খুশি যে তোমার কবর তোমাকে আগুনে পোড়াক?! নাকি তুমি চাও যে দাফনকাফন, গোসল আর জানাজার বদলে তোমাকে মরুভূমিতে ফেলে আসা হোক?!

আমি প্রথমত তাকে নসিহতের সুরে বোঝাতে থাকলাম। এরপর দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসেবে ভয় দেখানোর পন্থা প্রয়োগ করলাম। তাকে বললাম—তুমি যদি নামাজ না পড়, তবে আজকের পর থেকে তোমাকে আর আমি মেয়ে বলে পরিচয় দেবো না। আল্লাহর রহমতে—নাছোড় হয়ে এভাবে তার তদারকি, অনবরত উপদেশদান-ভয়ভীতি-ধমক ইত্যাদির ফলে সময় হারানোর পূর্বেই আমি তাকে সুষ্ঠুতা ও হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

জাহান্নামিদের প্রতি জান্নাতিগণের প্রশ্ন

কুরআনে এসেছে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

"তোমরা জাহান্নামে গেলে কী করে? তারা বলবে—আমরা নামাজ পড়তাম না, মিসকিনদের খাদ্য দান করতাম না, সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় লিপ্ত হতাম, বিচারদিবসকে অস্বীকার করতাম; আর এভাবেই আমাদের মৃত্যু এসে গেল। অতএব, সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না।" (সুরা মুদ্দাসসির: ৪৬-৪৮)

জান্নাতি এক ব্যক্তি জাহান্নামি আরেক ব্যক্তিকে ডেকে প্রশ্ন করবে—হে অমুক, তুমি জাহান্নামে কেন? তখন সেই ব্যক্তি উত্তরে যা বলবে, তারই বর্ণনা এসেছে অত্র আয়াতে।[২৭] [ইষৎ সংক্ষেপিত]

---

২৭. *ফাতহুল কাদির*: ৫/৩৩৩।

ছোট্ট মুয়াজের নামাজ শিক্ষা

আমার ছোটো ছেলেটি আমাকে নামাজ পড়তে দেখলে আমার অনুকরণ করে সেও নামাজ পড়তে থাকে। তার বয়স এখন সাত। আমি তাকে অনেক সময় নামাজের ফজিলত আর তা কেন পড়তে হয়, তা শোনাই।

তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক যেন পবিত্র স্রষ্টামুখী হয়, সে-জন্য আমি নিয়মিত তার সাথে আল্লাহ তায়ালার কথাবার্তা বলি। আমি তাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই, যার মাধ্যমে সে তাওহিদের মর্মসমূহের আলোকে জীবনযাপন করতে পারে।

আমি একদিন তাকে ছোটো একটি জায়নামাজ আর অজু করার জন্য আকর্ষণীয় রঙের একটি পাত্র কিনে দিলাম। এরপর তার সামনেই তার বোনদের বললাম—এই জায়নামাজ আর পাত্র কিন্তু শুধু মুয়াজের, কেউ যেন এগুলো না ধরে। 'শুধু মুয়াজের'—একথায় সে পুলকিত হয়ে ওঠে।

আমি যখন অজু করতাম, তখন অনুকরণ করার জন্য মুয়াজকে আমার কাছে রাখতাম। সে যখন সুন্দর করে অজু করতে পারতো, তখন আমি তাকে ভালো-ভালো কথা বলে উৎসাহ দিতাম। আমি তাকে আমার নামাজেরও অনুকরণ করাতাম। সে যখন সুষ্ঠুভাবে নামাজ পড়তে শিখে গেল, তখন আমি তাঁর বাবাকে বললাম, তিনি যেন এবার জামাতে নামাজ পড়ানোর অভ্যাস করিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর থেকে মুয়াজ আর তার বাবা নফল ও সুন্নত নামাজগুলো ঘরে পড়ত, তারপর ফরজ পড়তে মসজিদে যাওয়ার সময় তিনি মুয়াজকে ডাকতেন, তার আব্বুর মতো সেও নামাজে যাবে শুনে তার চোখমুখ ঝলমল করে উঠত।

তার আব্বু তাকে পুরস্কারস্বরূপ বিভিন্ন খেলনা কিনে দিতেন। তাকে বিভিন্ন নবির গল্প শোনাতেন। সেও তার বাবার কাছে এগুলো শুনতে ভালোবাসত। সহজে আত্মস্থ করার জন্য তিনি তার জন্য শিক্ষামূলক একটি ভিডিও ক্যাসেট এনে দিয়েছিলেন। মুয়াজ প্রতিবেশী ছেলেদের ডেকে নিয়ে আসত সবাই মিলে সেটি দেখার জন্য। সে তখন তাদের বলতো—প্রকৃত মুমিন হচ্ছে সে, যে আজান শুনে দ্রুত মসজিদে চলে যায়। তোমাদের মাঝে যে একদিনও না ছেড়ে ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ফরজ নামাজ মসজিদে আদায় করতে পারবে, তাকে আমি চকলেট খাওয়াবো।

প্রশ্নটি সন্তানের জান্নাত-জাহান্নামের!

আমি আমার সন্তানদের আল্লাহর তাকওয়ার ওপর গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কেননা, এখানে প্রশ্নটি হচ্ছে জান্নাত-জাহান্নামের, এতে উদাসীনতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। তাই আমার অবশ্যকর্তব্য ছিল, তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি মহব্বতের বীজ বপন করা।

আমার বড়ো ছেলের সাত বৎসর হওয়ার পরই আমি তাকে অজু আর নামাজের নিয়ম শিখিয়েছি। তার বাবা কখনো-কখনো তাকে মসজিদে নিতে চাইতেন না, কিন্তু আমি পীড়াপীড়িপূর্বক রাজি করিয়ে তাকে তাঁর সাথে দিয়ে দিতাম।

প্রত্যেক ওয়াক্তেই আমি আমার সন্তানের খেয়াল রাখতাম, এমনকি ফজরের নামাজটিও সে তার বাবার সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করতো। এরপর সে যখন দশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন নামাজ নিয়ে যদি কখনো তার গাফলতির কথা জানতে পারতাম, তবে আমি প্রহারের আশ্রয় নিতাম। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত তওফিক আল্লাহর, আমি আমার ছেলেকে নামাজের অভ্যাস করাতে সফল হয়েছি।

এ ক্ষেত্রে আমি আমার সন্তানদের সাথে যে-সমস্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি, সেগুলো নিম্নরূপ: আমি তাদের আল্লাহর আজাবের ভয় দেখিয়েছি। তাদের সালাফে সালিহিনের গল্প পড়ে শুনিয়েছি। তাদের অন্তরে তাকওয়া সঞ্চার করেছি। তাদের সকাল-সকাল ঘুমাতে উৎসাহ দিয়েছি। নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার আধা ঘণ্টা পূর্বেই নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে তাগিদ দিয়েছি। যে-কোনো সময় মৃত্যুর ফেরেশতা এসে দরজায় দাঁড়াতে পারেন, তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস দৃঢ় করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ, আমার বড়ো ছেলের বয়স এখন চৌদ্দ আর ছোটোটির বয়স নয় বছর। আমি উভয়ের ওপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। তারা এখন নামাজের ব্যাপারে যত্নবান। ঘটনাক্রমে আমি যদি ফজরের নামাজ শুরু হওয়ার আগে-আগে জাগ্রত হই বা অসুস্থ থাকি, তখন মসজিদে যাওয়ার জন্য আমার বড়ো ছেলেকে দ্রুত জাগিয়ে দেই। কিন্তু ছোটোটি যখন ঘুম থেকে জাগে, তখন আমার প্রতি অনুযোগ করে বলে—আমাকে কেন জাগাওনি নামাজের জন্য!

চিন্তিত মায়ের উপশম

আমার সন্তানদের নামাজের আদেশ করে কোনো লাভ নেই, কারণ তারা শুধু আমার সামনেই নামাজ পড়ে; আমার অনুপস্থিতির সময় যেইসেই! এমনকি আমি থাকাকালীনও আমার তাগিদ পেলেই কেবল নামাজে দাঁড়ায়, অন্যথায় নয়! আবার যখন দাঁড়ায়, তাও আদায় করে বোঝা মনে করে আর একগাদা বিরক্তি নিয়ে। আমি এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, নিজের মধ্যে বিরক্তি আর ব্যর্থতা অনুভব করছি। তাই আমার মধ্যেও তাদের তদারকির ব্যাপারে শিথিলতা, ঢিলেমি শুরু হয়ে গেছে।

হতাশাকে প্রশ্রয় নয়!

আপনি প্রতিদিনই তাদের শিক্ষাঙ্গনে যাওয়ার জন্য জাগ্রত করে থাকেন, যদিও তারা সাথে-সাথেই আপনার ডাকে সাড়া দেয় না। আবার আপনি না ডাকলে তারা নিজে-নিজেও কখনো ওঠে না। এমনকি আপনি যদি তাদের পেছনে পড়ে না থাকেন, তবে তারা বিদ্যালয়েই যায় না! আপনি যদি তাদের বাড়ির কাজ করার জন্য তাগিদ না দেন, তবে তারা সেটাও করে না। বস্তুত, তারা এরকম ঢিলেমি, আলসেমি সমস্ত কাজেই করে থাকে। তবে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি "ক্লান্ত হয়ে পড়েছি" বলেন না। যদি বলেও ফেলেন, তাই বলে বাস্তবেই কিন্তু তাদের পড়াশোনার তদারকির ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন শুরু করেন না, হাল ছেড়ে দেন না। বরং বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শীত বা গরমের তোয়াক্কা না করে সব সময়ই তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে থাকেন।

অতএব, জাগতিক ক্ষেত্রে যেহেতু আপনার মধ্যে আশ্চর্যজনক ধৈর্যস্থৈর্য প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, এবার আপনিই বলুন, এ ক্ষেত্রে সেগুলো কোত্থেকে এলো?!

এ ছাড়া, আপনার ছেলে যখন একটি শ্রেণি সমাপ্ত করে, তখন আপনি মনে-মনে আশা পোষণ করেন, সে যেন অপর শ্রেণিটিতেও কৃতকার্য হয়। এসবের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একদিনও বলেননি, "যথেষ্ট হয়েছে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,

আর পড়াশোনার দরকার নেই।" কারণ, আপনি জানেন যে এর ওপরই তার জাগতিক সুখ-সফলতা নির্ভর করছে, এর মাধ্যমেই সে চাকরিবাকরি, বেতন-ভাতা, উচ্চপদ ইত্যাদি লাভ করতে সক্ষম হবে।

অতএব বোন আমার, আল্লাহকে ভয় করুন! ভাই আমার, মনে আল্লাহর প্রতি ভয় জাগ্রত করুন! আপনারা আপন সন্তানকে জাগতিক বিষয়সমূহের ওপর আখেরাতের বিষয়াদি প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতায় গড়ে তুলুন। মসজিদে গমনের চেয়ে তার পড়াশোনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে যাবেন না। মনে রাখবেন, নামাজে অনুপস্থিত থাকা মুনাফিক অথবা নামাজত্যাগী দুরাচারীরূপে আপনার ছেলে বড়োসড়ো সব পদ হস্তগত করে নেবে, এতে মূলত গর্বের কিছু নেই। বরং আপনার গর্বের বিষয় হবে সেটিই যে—সে অল্পসল্প উপার্জনে জীবনযাপন করবে আর নিজেকে নামাজিদের অন্তর্ভুক্ত করে রাখবে। আর সে যদি দুনিয়া-আখেরাত দুটোই হস্তগত করে নিতে পারে, তবে তো সোনায় সোহাগা।[২৮]

আরো ভেবে দেখুন, আপনি যদি তাদের পড়াশোনার মান ক্ষুণ্ন হলে তা মেনে নিতে না পারেন, তাহলে বিশ্বপ্রতিপালকের দরবারে তাদের মান কমে যাওয়া কী করে মেনে নিচ্ছেন! মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখবেন, তাদের কাছে যখন কোনো আমানত রাখা হয়, তখন তারা সেটির খেয়ানত করে। অতএব, সন্তানের ক্ষেত্রে আপনি খেয়ানতকারী হতে যাবেন না!

---

২৮. *আবনাউনা ওয়াস-সলাত।*

নামাজের প্রতি অভিভাবকদের অবহেলা অনুচিত

কতক মা রয়েছে এমন, তাদের বাচ্চারা যদি পড়াশোনায় ফাঁকিবাজি করে কিংবা সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বিদ্যালয়ের পড়াশোনার ঘাটতির কারণে তারা ঠিকই চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করেন, তাদের প্রহার করেন। অথচ এরা যখন নামাজ পড়ে না, তখন তারা সেটি দেখেও না দেখার ভান করে থাকেন! আল্লাহ তাদের হেদায়েত দান করুন।

এবার আপনাদের নিকট আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শোনাই। আমার বাচ্চা যখন সাত বছর পূর্ণ করে, তখন আমি তাকে নামাজের জন্য চাপ দিতাম না, প্রহার করতাম না বা এ জন্য তার সাথে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিও করতাম না। বরং তাকে শান্ত কণ্ঠে নামাজ পড়তে বলতাম। আমি তাকে এভাবে বলতাম—তুমি যদি নামাজ না পড়, তাহলে আল্লাহ তোমার ওপর রাগ করবেন। তাই তিনি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবেন না, যেখানে তোমার সবগুলো পছন্দের জিনিস ছিল। বলো, তুমি কি চাও না যে আমি, তুমি, তোমার আব্বু আর তোমার ভাইয়ারা সবাই একসাথে জান্নাতে থাকি? যদি তা চাও, তবে আমাদের সবাইকে নামাজ পড়তে হবে আর আল্লাহর কথা মেনে চলতে হবে।

আমি প্রত্যেকদিন তাকে এগুলো শোনাতাম, তার কাছে বেশি-বেশি জান্নাতের গুণাগুণ বর্ণনা করতাম, যেন সে এর প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে নামাজ আদায়ের প্রতি মনোযোগী হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, আমার ছেলে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে-করতেই এখন বড়ো হয়ে উঠেছে। বস্তুত, আমি আমার সকল সন্তানকে আমার বর্ণনার চেয়েও বেশি আকারে উদ্বুদ্ধ করতাম।

আমি এটি লিখছি সে-সমস্ত মায়েদের উদ্দেশ্যে, যারা ইচ্ছা করেই আপন সন্তানকে নামাজের শিক্ষা দিতে উদাসীন থাকেন। মনে রাখবেন, আপনার সন্তানের ব্যাপারে কিন্তু আপনার দায়ভার রয়েছে, আর সে দায়ের জন্য অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে জিজ্ঞাসার কাঠগড়ায় দাড় করাবেন। কী জবাব দেবেন তখন আপনারা?!

নামাজ ত্যাগে শিথিলতা প্রযোজ্য নয়

আমার ছেলে-মেয়েদের নামাজের অভ্যাস করানোর প্রচেষ্টা শুরু হয় আমার বড়ো মেয়ের বয়স যখন সাত আর ছোটো ছেলের বয়স ছয়। আমি তখন তাদের আজান শোনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতাম। তাদের বোঝাতাম আজানের উদ্দেশ্য কী, এটি শোনার পর আমাদের কর্তব্য কী—হ্যাঁ, অবশ্যই তা হচ্ছে নামাজ আদায় করা।

আমি আমার সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়তাম। তাদের দীক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে প্রতিটি ফরজ নামাজে আমি সুরাগুলো একটু উঁচু আওয়াজে পড়তাম। একসময় দেখা গেল, আমার সন্তানরা নামাজের ওয়াক্ত হলে মোটামুটি স্বতস্ফূর্তভাবেই সাড়া দিচ্ছে আর আজানের সাথেও তাদের খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

কিন্তু এভাবে চলার পর একসময় নামাজের প্রতি আমি তাদের কিছুটা পিছুটান লক্ষ করি। তখন আমি তাদের আল্লাহর ভয় আর তাঁর সওয়াবের কথাবার্তা শোনানোর পদ্ধতি গ্রহণ করি। এর প্রতিক্রিয়া ছিল বেশ ভালো। সত্য বলতে, একে আমি নিজের নফস আর সন্তানদের সাথে চরম সাধনা বলেই মনে করে থাকি, যেখানে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্তি।

ফজরের নামাজের ক্ষেত্রে তাদের ছোটো-বড়ো কারো সাথেই আমি অনেকের-দেখানো হেয়ালিপূর্ণ ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাইনি। তেমন ডাকাডাকি ছাড়াই সকলে উঠে নামাজ আদায় করে নিতো, তারপর আবার ঘুমিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় জাগ্রত হতো। তাদের নামাজের অভ্যাস করাতে ভালো ও মন্দ পরিণতির কথাবার্তাসংবলিত প্রভাব সৃষ্টিকারী কিছু অডিও ক্যাসেট কিনে দেওয়ার পদ্ধতিটিও আমি প্রয়োগ করেছিলাম।

প্রশ্ন: যে ব্যক্তি অফিসের সময় হওয়ার ওপর নির্ভর করে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সে অনুযায়ীই নামাজ পড়েন, যে-কারণে ফজরের নামাজ ৬.৩০-এ হোক বা ৭টায়, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না, তার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত? তিনি কি এ ক্ষেত্রে গুনাহগার হবেন? আর তার নামাজেরই-বা কী হুকুম?

উত্তর: সন্দেহাতীতভাবে সেই ব্যক্তি গুনাহগার হবেন! তিনি সে-সব লোকের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবেন, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অথচ এই বিষয়টির নিন্দা জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"বস্তুত, তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ আখেরাতের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সুরা আলা: ১৬-১৭)

আর তার এই নামাজ কবুল হবে না এবং তিনি দায়মুক্তিও পাবেন না। এ ব্যাপারে তিনি কেয়ামতের দিন আটক হবেন। অতএব তার কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নিকট তওবা করা এবং ফজরের সময় উঠে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা। তারপর অফিসের সময় হওয়ার পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেওয়া। (ইবনে উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)।[২৯]

হজরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যে নামাজ পড়ে না, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।"

২৯. সালেম জুহানি সংকলিত *ফাতাওয়া মুহিম্মাতুন আন সলাতিল ফাজর:* ১৯।

ঘরকে নিষ্কলুষ রাখা

আল্লাহর রহমতে আমার সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আমি আমার স্বামীকে সহযোগিতা করতে পেরেছি। তাদের কথা মাথায় রেখে আমরা কেউই আমাদের ঘরে স্যাটেলাইট চ্যানেল আর অশ্লীল ম্যাগাজিন ঢুকতে দেইনি। তারা জন্মের পর থেকে ঘরে কুরআনের তেলাওয়াত আর ইসলামি আলোচনা ছাড়া কিছু শুনেনি। আল্লাহর কথা মান্য করা ও নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের ওপর এগুলোর বড়ো ধরনের প্রভাব ছিল।

আমার মেয়েরা ছোটো থেকেই আমার সাথে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ত। আমি যদি তখন তাদের মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি লক্ষ করতাম, তবে তা ঠিক করে দিতাম, ফলে সেটি তাদের মধ্যে স্থায়ীত্ব না পেয়ে ধীরে-ধীরে শুধরে যেত।

আমার স্বামী আমাকে এ ক্ষেত্রে খুব সহায়তা করেছেন। তিনি তাদের সাথে উৎসাহপ্রদানমূলক আর বাচ্চাসুলভ আচরণ করতেন, তাদের জন্য চকলেট, পোশাকাদি নিয়ে আসতেন। তাদের মধ্যে যে সবগুলো ফরজ নামাজ পড়ত, বিশেষ করে ফজরেরটি, পুরস্কারস্বরূপ তাকে তিনি এক রিয়াল দিয়ে দিতেন, কখনো-বা দুই রিয়ালও দিতেন। নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে এটি তাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে যে সময়মতো নামাজ পড়ত না, তাকে কোনো রিয়াল দিতেন না, বেড়াতে নিয়ে যেতেন না, আমোদপ্রমোদেও শরিক করতেন না। এভাবে তার মধ্যে একধরনের অপরাধবোধ তৈরি করতেন।

প্রশ্ন: যেই ব্যক্তির ছেলেদের জাগ্রত করতে গিয়ে তার নিজেরই ফজরের নামাজের জামাত ছুটে যায়, তার হুকুম কী? তাকে কী বলে উপদেশ দেওয়া যায়?

উত্তর: এ ক্ষেত্রে আমি তাকে উপদেশ দেবো, তিনি যেন তার ছেলেদের আজানের পূর্বেই জাগিয়ে দেন, তাহলে তিনি জামাতে নামাজ পেয়ে যাবেন। ছেলেদের জাগানোর অজুহাতে নিজের জামাত ছেড়ে দেওয়া তার জন্য নৈতিক হবে না। এ ক্ষেত্রে প্রতিষেধক এটিই যে—তাদের জাগানোও যায়, আবার তিনিও জামাত পান, এরকম সময় হাতে নিয়ে তদবির শুরু করতে হবে। পক্ষান্তরে, আজান হলে তিনি নিজে জাগবেন, এরপর এতগুলো ছেলেকে জাগ্রত করবেন, আবার এদের মধ্যে কেউ-কেউ ঘুমকাতুরেও হতে পারে, তবে এটি সেই ব্যক্তির শিথিলতা বলেই বিবেচিত হবে। (ইবনে উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ)।

মেহমান শিশু

ইমাম আবু দাউদ রহ. হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, "আমি একদিন আমার খালা [নবিজির স্ত্রী] মাইমুনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে রাত কাটালাম। রাতে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বাচ্চাটি নামাজ পড়েছে? ঘরের লোকেরা বললেন, জি।"[৩০]

লক্ষ করুন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তখনো নাবালক ছিলেন, কারণ নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বাচ্চা (গোলাম) বলে ডেকেছেন; আর এ শব্দে ডাকা হয় মূলত জন্মের পর থেকে নিয়ে বালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

হাদিসটিতে আমাদের জন্য এই নির্দেশনা রয়েছে, নিকটাত্মীয়রা যখন বেড়াতে আসে, তখন আপ্যায়নকারীর জন্য তাদের বাচ্চাদের নামাজের খেয়াল রাখা কর্তব্য। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, অনেক বাচ্চার বাবা-মা বাড়িতে তাদের নামাজ আর দ্বীনি বিষয়াদি পালন করানোর প্রতি লক্ষ রাখলেও বাচ্চারা যখন কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যায়, তখন আর আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে সেই খেয়াল রাখা হয় না; এমনকি তাদের অভ্যাসও ছুটে যায় (লা হাওলা ওয়া-লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। এই অল্প একটু সময় বা মাত্র কয়েক দিনে বাবা-মাদের বছর-মাসের সাধনার ফসল বিনষ্ট হয়ে পড়ে! তাই নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হচ্ছে, তাদের নিকট আগত আত্মীয়স্বজনের বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ রাখা। এ ব্যাপারে তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। সে-সব বাচ্চার নামাজ আর দ্বীনি অন্যান্য বিষয়ের তদারকির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করা তাদের দায়িত্ব।[৩১]

---

৩০. *সুনানে আবু দাউদ*: ১৩৫৩।

৩১. *আল-ইহতিসাবু আলাল আতফাল*: ২৬-২৭।

প্রথম সন্তানের বিশেষ গুরুত্ব

আমি বেশ কয়েকটি সন্তানের মা। আপনাদের সাথে আজ তাদেরকে গড়ে তোলার পেছনে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ করছি।

আমি আমার প্রথম সন্তান প্রতিপালনের সময় থেকেই নিজের শ্রমঘাম উজাড় করে দিয়েছিলাম। কারণ, সে তার ভালো-মন্দসহই বাকি সন্তানদের সামনে উপমা হয়ে উঠবে। তাই সেই সন্তানের সময় থেকেই তার প্রতিপালন আর তার পরহেজগারি ও সততাপ্রাপ্তির ব্যাপারে আমি আল্লাহ তায়ালার শরণাপন্ন হই। প্রতিটি নামাজের সময় আমি অনবরত তাঁর কাছে দোয়া করে গেছি। তাকে সৎ করে গড়ে তোলার পেছনে আমি বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছি। আমার ঘরে আমি ধ্বংসাত্মক স্যাটেলাইট চ্যানেল ঢুকতে দেইনি, সঙ্গীত বা গান-বাদ্যকে প্রশ্রয় দেইনি। আমি খুবই সূক্ষ্ম কৌশলে আমার সন্তানের নাগালে থাকা হারাম সঙ্গীতের উপাদানগুলো দ্বীনি ও উপকারী সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিয়েছি। আমরা যখন গাড়ি দিয়ে কোথাও যেতাম, তখন সাথে একটি ইসলামি ক্যাসেট নিয়ে নিতাম। এরপর তাকে বলতাম—চলো একসাথে মন দিয়ে শুনি।

এগুলোর পাশাপাশি তাকে ওয়াক্তমতো জামাতে নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহপ্রদান ও তদারকির বিষয় তো ছিলই। এমনকি প্রচণ্ড শীতের রাতেও আমি তাকে নামাজ অবিরত রাখার প্রতি উৎসাহ দিতাম, এ ক্ষেত্রে তার প্রশংসা করতাম। তদ্রূপ, কুরআন হেফজের দরসে বসা, জিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণ করা, সৎ লোকদের সাথে ওঠাবসা করা ইত্যাদির ব্যাপারেও আমি তার আগ্রহ-উদ্দীপনা জোগাতাম।

আমি তাকে অনেক সময় বলতাম—ইনশাআল্লাহ, তুমি আমাদের অঞ্চলের মসজিদের ইমাম হবে, এরপর হারামাইন শরিফাইনের কোনো একটি মসজিদেরও ইমাম হয়ে যাবে! আল্লাহর রহমতে আমার ছেলে ইতোমধ্যে ১৯টি বসন্ত পার করে ফেলেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, তবে আমি আশা করি সে উত্তম এক তরুণ হয়ে উঠেছে। সে প্রতিটি নামাজ ওয়াক্তমতো জামাতের সাথে আদায় করে, জিকিরের মজলিসগুলোতে উপস্থিত হয়। তার মাধ্যমে আমি আমার অন্যান্য সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও সহায়তা পাচ্ছি। সে সর্বদা তাদের নামাজ পড়তে বলে, নিয়মিত নিজের ভাইদের সাথে করে মসজিদে নিয়ে যায়।

আমরা নিজেরা আর সে যেন আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকতে পারি, সে ব্যাপারে মহান রবের কাছে মিনতি জানাচ্ছি। সবটুকু প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

স্ত্রীর ভূমিকা

আমার অভিজ্ঞতার ব্যাপারে বলতে গেলে, আমি এখনো আমার স্বামীকে নিয়ে মুসিবতে আছি। আলহামদুলিল্লাহ, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন সৎ লোক আর প্রতিটি ফরজ নামাজের ব্যাপারেই যত্নবান; কিন্তু বিপত্তি ঘটে ফজরের নামাজে—কারণ তিনি ঘুমকাতুরে, প্রচণ্ড পরিমাণে! এ থেকে উত্তরণের জন্য আমি যে-সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছি, তা নিয়েই আমার বিবরণ:

• সকাল-সকাল ঘুমিয়ে যেতে সাহায্য করেছি, কিন্তু এতে দেখা গেছে যে তার ঘুম যেন আরো বেড়ে গেছে!

• তার মুখে পানি ছিটানোর পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি, কিন্তু এতে তার বকা খেয়ে ফিরে এসেছি।

• শরীর থেকে চাদর কেড়ে নিয়েছি; কিন্তু এতেও উপকার হয়নি। তিনি উঠে দাড়িয়ে তারপর আবার শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

• অনবরত ডাকাডাকি; কিন্তু এতেও আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ডাকতে-ডাকতে একসময় নামাজের সময়ই চলে যায়, কিন্তু তার আর জাগা হয়ে ওঠে না।

আমি এখনো এই মুসিবত নিয়ে চিন্তিত। এর কোনো দ্রুত সমাধান ও কার্যকর পদ্ধতির ফিকিরে এখনো ঘুরপাক খাচ্ছি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,
আমি আপনাদের কাছে এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করলাম, যেখানে একজন মহিলা তার সন্তানকে নয়, বরং তার স্বামীকে জাগানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন! আপনাদের সামনে এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তুলে ধরার কারণ হচ্ছে এই ব্যাপারটি দেখানো যে—অভিভাবকগণ যদি তাদের সন্তানকে ফজরের নামাজের অভ্যাসের ব্যাপারে অবহেলা করে, তখন তার পরিণতি কী দাঁড়ায়! এই সন্তান বড়ো হতে থাকে, বিয়ে করে ফেলে, এমনকি তার বাচ্চাকাচ্চাও হয়ে যায়, অথচ সে ঠিকঠাক সময়ে নামাজ আদায় করতে পারে না! তাহলে সে কীভাবে তার সন্তানকে নামাজের ওপর গড়ে তুলবে, যেখানে সে নিজেই জেগে উঠতে পারে না?!

এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর কষ্টের ব্যাপারে আর কী বলব! যেখানে স্বামীর হওয়ার কথা ছিল তার আনুগত্যে সহযোগী, কিন্তু এখানে উল্টো তিনিই তার ও আপন সন্তানদের ওপর বোঝা হয়ে উঠেছেন। সন্তানদের ফজরের নামাজে জাগ্রত হওয়ার

অভ্যাস করানো ও সে-ক্ষেত্রে আদেশদানের ব্যাপারে তার যে দায়িত্ব ছিল, তা থেকে তো তিনি পুরোপুরি লাগাম খুলে বসে আছেন!

এতক্ষণ যেই মহিলার কথা আলোচনা করলাম, নিশ্চয় আল্লাহ তার সহায়তাকারী হিসেবে রয়েছেন। কারণ, তিনি তার স্বামীকে অফিসের জন্য জাগানোর পূর্বে ফজরের নামাজে জাগানোর তদবির করে থাকেন। তিনি আপন স্বামীকে নফস ও শয়তানের হাত থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকরভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন—উনি যে আর কেউ নন, তার ভালোবাসার স্বামী! প্রকৃতপক্ষে, কোনো মুমিন স্ত্রীই এ জেনে খুশি থাকতে পারে না যে—ঘুমিয়ে ফরজ নামাজ কাজা করার কারণে পাথর দিয়ে মাথা ফাটিয়ে তার স্বামীকে আজাব দেওয়া হবে! অতএব প্রিয় বোন আমার, আপনিও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যমতো সহযোগিতা করে যান।

হজরত সামুরা বিন জুনদুব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবিদের অনেক সময় জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ? এরপর তাঁর কাছে বিভিন্নজন তাদের স্বপ্নের কথা বলতো। এরমধ্যে একদিন সকালে তিনি আমাদের বললেন, আজ রাতে আমার কাছে দুজন ব্যক্তি এলো, এরপর আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল। তারা আমাকে বলল, চলুন; আমিও তাদের সাথে চললাম। চলতে-চলতে আমরা শুয়ে-থাকা এক লোকের কাছে এলাম, যার পাশে এক ব্যক্তি একটি পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে শোয়া ব্যক্তির মাথায় পাথরটি দিয়ে আঘাত করছিল, এতে তার মাথাটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। পাথরটি তখন নিচে পড়ে যাওয়ার ফলে দাঁড়ানো ব্যক্তি পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যেত, এই ফাঁকে শোয়া ব্যক্তির মাথা আগের মতো ঠিক হয়ে যেত। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি আবার প্রথমবারের মতো করতো। ...

আমি তাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ রাতে আশ্চর্য সব জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম, এগুলোর রহস্য কী? তখন তারা বলল, জি, সেগুলোর কথা এবার বলছি। মাথা চূর্ণ হওয়া প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে এমন লোক, যে কুরআনের ইলম গ্রহণ করে তার আমল ত্যাগ করেছিল আর ফরজ নামাজের সময় ঘুমিয়ে থাকত।[৩২]

---

৩২. *সহিহ বুখারি*: ৬৬৪০।

দাদার ভূমিকা

আমার ছেলে যদি সপ্তাহের সবগুলো নামাজ আদায় করতে পারতো, তবে তাকে আমি পুরস্কৃত করতাম। এ ছাড়া, কিছু বাচ্চার জামাতে নামাজ পড়তে যাওয়ার কথা জানতে পেরে সে নিজেও জুমা ও জামাতে নামাজ পড়ার ব্যাপারে খুব উৎসাহিত হয়। আমি তার অজু ও নামাজের তদারকি করতাম। এতে তার নামাজে যদি দ্রুতপরায়ণতা বা অজুতে অসম্পূর্ণতা লক্ষ করতাম, তবে ভুলটি যেন আর না বাড়ে, সে-জন্য তাকে সরাসরি সতর্ক করতাম আর নম্রকোমলভাবে উপদেশ দিতাম।

তবে সে জামাতের সাথে ফজরের নামাজে অভ্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরো অবদানটুকুই তার দাদার। সত্য বলতে, এ ব্যাপারে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশেষে আল্লাহ বাবুর দাদার মাধ্যমে তা সহজে সম্পন্ন করে দিলেন।

তিনি আমাদের এখানে এক মাসের মতো ছিলেন। সে-সময় তিনি আমার ছেলেকে ফজরের নামাজ পড়তে উৎসাহ দিতেন। তার মাথার কাছে এসে বলতেন—শোনো, নামাজ কিন্তু ঘুমের চেয়ে উত্তম। শয়তান এখন তোমাকে বলছে—না না, ঘুমই ভালো। সুতরাং, তুমি উঠে গিয়ে তাকে রাগিয়ে তোলো। এরপর অজু আর নামাজ আদায় করে একদম যুদ্ধ জয় করে ফেলো!

এরপর ধীরে-ধীরে সে তার আব্বুর সাথে ফজরের নামাজ পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বস্তুত, সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে হজরত লুকমান (আলাইহিস সালাম)-এর উপদেশ উল্লেখ করেছেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

"হে আমার ছেলে, তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো।" (সুরা লুকমান: ১৭)

লক্ষ করুন, হজরত লুকমান কর্তৃক নিজের ছেলেকে নামাজের আদেশদানের কথা স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে! আসলে এমনটিই স্বাভাবিক। কেননা, নামাজ যে ইবাদতসমূহের মাতৃসদৃশ, সকল কল্যাণের খুঁটি!

শিক্ষিকার ভূমিকা-১

আমার ছাত্রীদের বয়স সাধারণত নয় থেকে দশ বছর। আমি প্রথমে তাদের কাছে জান্নাত আর সেখানকার ভালো-সুস্বাদু জিনিসগুলোর বর্ণনা প্রদান করে থাকি। আমি লক্ষ করেছি, এই বয়সের বাচ্চারা খাবার-পানীয়ের প্রতি, বিশেষত ফলফলাদি ও চকলেটের প্রতি খুব আসক্ত হয়ে থাকে। তাই আমি তাদের বলি, জান্নাত কিন্তু এসব আর এরচেয়েও মজার-মজার জিনিসে ভরপুর! তাদের আরো বলি, সেখানে নামাজি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

এরপর তাদের অজু করিয়ে জোহরের নামাজ পড়ানোর জন্য যথাস্থানে নিয়ে যাই। আমি খেয়াল করেছি, ওরা হাতেকলমে কিছু করতে ভালোবাসে, তাই আমিও ব্যাপারটির প্রতি গুরুত্ব দেই। এ ছাড়া, নামাজ নিয়ে চিত্তাকর্ষক কিছু ঘটনা শোনানো এবং মুসলিম নারীদের কাছে এর গুরুত্বের কথাও তাদের নিকট তুলে ধরতে ভুলি না।

শিক্ষিকার ভূমিকা-২

আমার মেয়ে যখন সাত বছর বয়সে পা রাখে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালনার্থে তখন থেকে আমি তাকে নামাজের আদেশ করতে শুরু করি। কিন্তু সে একবার পড়লে আরেকবার ভুলে যেত। এরপর সে যখন চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠে, তখন থেকে খুশুখুজুর সাথে সময়মতো নামাজ আদায় করতে শুরু করে। বস্তুত, এর পেছনে তার ধর্মশিক্ষিকার বড়ো অবদান রয়েছে। তিনি তার ছাত্রীদের সামনে দুনিয়া ও আখেরাতে নামাজ ত্যাগকারীর শাস্তির ব্যাপারে আলোচনা করতেন। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পিতা-মাতারা বাচ্চার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে যোগাযোগ তাদের অনুরোধ জানাতে পারেন, তারা যেন বাচ্চাদের সাথে নামাজের গুরুত্ব নিয়ে কথাবার্তা বলেন। আপনার সন্তানদের যেন নামাজের ওপর যত্নবান করে তোলেন, তাদের নিয়মিত উৎসাহ প্রদান করেন, এ ব্যাপারেও তাদের বিশেষ অনুরোধ জানালেন।

এও পারেন, তাদের নিকট নামাজ সংক্রান্ত কোনো চিরকুট বা বইপত্র পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ জানালেন, তারা যেন সেগুলো শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে আপনার সন্তানের শ্রেণিকক্ষে পড়ে শোনান।

মুসলিম সন্তানদের পেছনে এরকম দিক-নির্দেশনামূলক কাজের ফলে আপনি অবশ্যই আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখতে পারেন।

শিক্ষকের ভূমিকা

আমি যখনই নামাজে দাঁড়াতাম, তখন আমার বাচ্চা ছেলেকে আমার অনুকরণ করার জন্য পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিতাম। তবে বহু চেষ্টার পরেও তাকে দিনে কেবল কয়েক ওয়াক্ত নামাজের অভ্যাস করাতে পেরেছিলাম।

কিন্তু একটি ঘটনা আমার নিজের, সন্তানদের আর স্বামীর জীবনে বেশ ভালো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমার ছেলে তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। একবার তার শিক্ষক তাদের বললেন, যারা মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করবে, তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। সত্য বলতে, আমি আর আমার স্বামী ফজরের নামাজে হঠাৎ-হঠাৎই জাগ্রত হতাম। এতে দেখলাম, আমার ছেলে অনবরত কেঁদে যাচ্ছে। কারণ, এলাকার ছেলেরা তার শিক্ষককে জানিয়েছে, সে ফজরের নামাজে যায় না। তবে নামাজে যাওয়ার জন্য এই অন্ধকারে তাকে একা-একা ছাড়তেও আমি সাহস পাচ্ছিলাম না। তাই আমি তখন অ্যালার্মঘড়ির ব্যবস্থা করি। ফজরের সময় নিজে জাগ্রত হয়ে স্বামীকে জাগিয়ে দিতাম, তিনি যেন ছেলেকে নিয়ে মসজিদে যান। এরপর থেকে আল্লাহর রহমতে আমাদের আর ফজরের নামাজের ওয়াক্ত ছোটে না।

শিক্ষকের অবদান কখনো-কখনো পিতার চেয়েও বেশি হয়।

ইমাম সাহেবের ভূমিকা

আমি সাধারণত আমার ছেলে ইবরাহিমকে বলতাম, সে যেন তার আব্বুকে নামাজের জন্য জাগিয়ে তোলে। সে তাঁকে জাগালে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে মসজিদে যাবে কি না। ইবরাহিম এতে আনন্দিত হয়ে উঠত। তখন তার আব্বু তাকে শর্ত দিতেন—আদবের সাথে নামাজ পড়তে হবে আর বেশি নড়াচড়া করা যাবে না, তাহলে তিনি তাকে চকলেট কিনে দেবেন।

ইবরাহিম একদিন মসজিদ থেকে খুব আনন্দিত হয়ে ঘরে ফিরল। এরপর বলল—আমি আজ ইমাম সাহেবকে সালাম দিয়েছি আর তিনি আমাকে একটি ক্যাসেট দিয়েছেন! আমি এখন থেকে প্রত্যেকদিন মসজিদে যাব, আব্বু!!
ইমাম সাহেব আমার ছেলের সাথে বিভিন্ন কথা বলেছেন, তার জন্য দোয়া করেছেন, ইবরাহিম সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। তিনি তাকে বলেছেন, সে যেন পরবর্তী নামাজেও তার সাথে দেখা করে। এতে ইবরাহিম মসজিদে যেতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এদিকে আমার মেয়ে শাইমা; তাকে আমি বললাম—যে নামাজ ত্যাগ করে, আল্লাহ তার চেহারা অন্ধকার করে দেন। পক্ষান্তরে যে নামাজ আদায় করে, তার চেহারা তিনি উজ্জ্বল করে দেন। এতে তার মধ্যে আপন চেহারা উজ্জ্বল করে তোলার প্রেরণা ও পাপের দ্বারা তাতে অন্ধকার সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্কতা আসে।

মোটকথা, সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আমার নিকট সর্বোত্তম পদ্ধতি মনে হয়, তাদের সাথে এ নিয়ে কথাবার্তা বলা, উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা আর অবিরত নামাজের আদেশ করে যাওয়া।

আল্লাহর নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নামাজ হচ্ছে আলো।" (*সহিহ মুসলিম*: ২২৩—দারে তাইয়িবা—)।
অর্থাৎ, অন্তরস্থ আলোক। আর মানুষের অন্তর যখন আলোকিত হয়ে পড়ে, তখন তার চেহারাও আলোঝলমল হয়ে ওঠে এবং তার শরহে সদর হয়ে যায়। এ ছাড়া এই নামাজ কবরেরও আলো। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, কবর হচ্ছে চন্দ্র-সূর্যের আলোবিহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার একঘর; কিন্তু ব্যক্তি যদি নামাজি হয়ে থাকে, তবে তার কবরে সেই নামাজ আলো ছড়াবে। তদ্রূপ, এই নামাজ হাশরের মাঠেও আলোকের কাজ দেবে।

যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

"সেদিন তুমি মুমিন নারী-পুরুষদের দেখতে পাবে, তাদের সম্মুখ ও ডানপাশে তাদের আলো ছোটাছুটি করছে।" (সুরা হাদিদ: ১২)[৩৩]

ফুফুর দায়িত্ব

আমরা আর ভাইয়ার পরিবার এক বাড়িতেই বসবাস করি। তার একটি মেয়ে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বিকালে সে যেখানে কুরআন হেফজ করতে যায়, আমি সেখানকার শিক্ষিকা।

আমাদের সিলেবাসে নামাজশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকায় আমার বেশ সুবিধা হয়েছে। আমি তাকে নামাজ শেখানোর কথা মাথায় রেখে তার সাথে একটি ওয়াদা করি—সে যদি ভালো করে নামাজ পড়তে শিখে যায়, তাহলে আমি তাকে ক্লাসের ছাত্রীদের নামাজের প্রশিক্ষিকা বানিয়ে দেবো। তখন সে অন্য ছাত্রীদের নামাজ শেখাবে আর তা আত্মস্থ করানোর জন্য তাদের নামাজের ইমামতি করবে। এতে সে খুব আনন্দিত, উৎসাহী হয়ে ওঠে। সুতরাং, সে বাড়িতে থাকাকালীন নামাজের সময় ঘনিয়ে এলে আমি তাকে অজু করে প্রস্তুত হয়ে আসতে বলি।

এই পদক্ষেপটি ক্লাসের ছোটো মেয়েদের নামাজ শিখতে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করে। কারণ, তাদেরই মতো ছোটো কেউ যদি তাদের কিছু শেখাতো, তবে তারা বেশি আগ্রহ বোধ করতো। এ ছাড়াও, প্রতিটি মেয়ে নামাজ আত্মস্থকরণে আগ্রহী হয়ে ওঠার আরো কারণ ছিল—ঠিকভাবে যারা তা আদায় করতে পারতো, পরবর্তী সময়ে ইমামতির জন্য তাদেরই ডাকা হতো এবং আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য তাদের চকলেট ও বিভিন্ন সজ্জাসামগ্রী পুরস্কার দেওয়া হতো।

---

৩৩. ইবনে উসাইমিন রচিত *আহকামুস সলাত*: ৫।

যে-সমস্ত অভিভাবক ঘরের বাচ্চাদের প্রতিপালন করেন, যেমন দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুফু, মামা-খালা প্রমুখ, তারা প্রত্যেকই বাচ্চাদের নামাজ এবং অন্যান্য সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। কারণ, কেউ যখন কারো দায়িত্ব নেয়, তখন অধীনস্থ ব্যক্তির ওপর অত্যাবশ্যক কাজগুলোর তদারকিও তার কর্তব্য হয়ে যায়। এতিমদের তত্ত্বাবধায়কগণও এই বিধির বাইরে নন। কেননা, তারা সন্তানটির পিতা-মাতার পক্ষ থেকে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করছেন। তদ্রূপ, শিশুরা যতক্ষণ শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট অবস্থান করে, ততক্ষণ তারাও এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকেন।[৩৪]"

বড়ো ভাইয়ের দায়িত্ব

প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বড়োদের অনুকরণের প্রেরণা কাজ করে। আমার সন্তানদের মধ্যে নামাজের উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে আমি বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছি।

আমি আমার মেয়েদের জন্য জায়নামাজ আর আচ্ছাদন কিনে দেই। তাদের মধ্যে যে নামাজের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করতো, তাকে আমি প্রশংসা ও পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করতাম। আমি তাদের মধ্যে ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছি। যেমন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

"তার মোহর হবে কস্তুরীর; অতএব, প্রতিযোগীরা যেন এতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।" (সুরা মুতাফফিফিন: ২৬)

আমি আমার সন্তানদের সব সময় বলতাম, নামাজ ত্যাগকারী আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নষ্টকারী রূপে পরিণত হয়। আর আল্লাহর সাথে এরকম করার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের আগুন! (এ থেকে আল্লাহ আমাদের মুক্তি দান করুন!)

আমি বিভিন্ন সময় তাদের কানে একথা পৌঁছাতাম যে—আমি নিজের বিষয় হলেও অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের ছাড় দিতে রাজি আছি, কিন্তু আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে আমি কখনোই তা করব না! যদি ভালোয়-ভালোয় কাজ না হয়, তবে নিশ্চয় আমি উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করব!

---

৩৪. *আল-ইহতিসাবু আলাল-আতফাল*: ৭৬।

ছোটো সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আমি আমার বড়ো ছেলেদেরও সহায়তা নিয়েছি। আমার বড়ো ছেলে ছোটোদের নিয়ে মসজিদে যেত। আমি তাদের অন্তরে এই কথা প্রোথিত করে দিয়েছিলাম যে—নামাজের ক্ষেত্রে যদি বড়ো কেউও গাফলতি করে, তবে তাকেও সেই কথা বলতে হবে। সুতরাং, আমাদের কেউ যদি নামাজের ব্যাপারে অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেকই একে-অপরকে স্মরণ করিয়ে দেবো।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "অধীনস্থদের নামাজের আদেশ করা প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্তব্য, এমনকি অধীনস্থ মানুষটি যদি নাবালকও হয়। পক্ষান্তরে, যে নিজের অধীনস্থ এতিম ও সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দেবে না, তাকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে, কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সুস্পষ্ট অবাধ্যতা করেছে।"

বোনের দায়িত্ব

আমার সাত বছর বয়সি ভাইকে আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে অভ্যাস করিয়েছি। নামাজের ওয়াক্ত ঘনিয়ে এলেও যদি সে খেলাধুলায় লিপ্ত থাকত, তবে আমি তাকে মসজিদে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। সে যদি কথা না মানতো, তবে আমি আব্বুকে বলে দেবো বলে ভয় দেখাতাম। এতে কখনো সে ভয় পেয়ে মসজিদে চলে যেত, আবার কখনো খেলাধুলাতেই মগ্ন থাকত। তখন আমি আব্বুকে ফোন করে তা বললে তিনি তার সাথে কথা বলে অল্পস্বল্প শাসাতেন, তবে বেশি ধমক দিতেন না। কারণ, এতে নামাজের প্রতি তার বিরক্তি সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সে যখন কথা শুনত, তখন আমি তার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাকে এটা-সেটা উপহার দিতাম। ঘুম বা খেলাধুলার কারণে অল্পস্বল্প ব্যতীত এখন আর তার নামাজ ছোটে না।

ভাইয়ের দায়িত্ব

আবু আব্দুল্লাহ নামক সত্তর বছর বয়সি একজন লোক আমাদের বলেন, আমরা যুবক বয়স থেকেই নামাজের ওপর যত্নশীলতা নিয়ে বেড়ে উঠেছি। নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরপরই আমরা মসজিদে চলে যেতাম, আমাদের কাছে তা কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু বিপত্তি ঘটে আমার কিশোর এক ভাইকে নিয়ে। আমি আর অন্য ভাইয়েরা যখন ফজরের নামাজের জন্য বের হতাম, তখন তাকে জাগিয়ে তোলা সত্ত্বেও গভীর ঘুমের কারণে সে যেতে পারতো না। আমার ভাই নামাজ পড়বে না, ব্যাপারটি আমার কাছে মোটেও ভালো লাগল না। তাই আমি চিন্তা করতে লাগলাম, কীভাবে তার মধ্যে নামাজের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা যায়। চিন্তাভাবনার পর আমি তাকে বললাম—তুমি যদি দুই সপ্তাহ ফজরের নামাজ পড়ে দেখাতে পার, তবে তোমার জন্য দামি পুরস্কার রয়েছে। সে আমার প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত ছিল। এরপর থেকে সে আমাদের সাথে জেগে-উঠে জামাতে গিয়ে নামাজ পড়তে লাগল। তারপর সময় পূরণ হলে আমি তার হাতে পুরস্কার তুলে দিলাম, কিন্তু সে তা না নিয়ে বলল—আমি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নামাজ পড়ি। ভাইয়া, আমাকে এভাবে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ যেন তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।

ঘরের সকল মানুষ থেকে সাহায্য নেওয়া

আমার ছোটো ছেলেদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি ঘরে যাদের ওপর নামাজ ফরজ হয়েছে, তাদের সকলেরই সহায়তা নিয়েছি। আমি তাদের একথা বলে দেই যে—নামাজের সময় হলে তাদের সাত থেকে দশ বছর বয়সি ভাইদের যেন তারা জাগিয়ে তোলে, নামাজের জন্য তাগিদ দেয়।

আমি কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত নামাজের প্রতি ব্যগ্রতার ফজিলতগুলো শুনিয়ে তাদের উৎসাহ দিতাম। আমি বারবার তাদের এই আয়াতটি পড়ে শোনাতাম,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

"অগ্রবর্তীরা তো অগ্রবর্তীই, তারা হচ্ছে নৈকট্যশীল এবং নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের অধিবাসী।" (সুরা ওয়াকিয়া: ১০-১২)

আমি সুরা ওয়াকিয়া, সুরা ইনসান (সুরা দাহর)-সহ অন্যান্য সুরা পড়ে তাদের কল্পনায় জান্নাতের চিত্র এঁকে দেখাতাম। তাদের আমি উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন নাশিদও পড়ে শোনাতাম,

بنيّ توضأ وقم للصلاة وصلّ لربك تكسب رضاه

إذا رضي الله عن مسلم أتاه السعادة ونال الهناء

বৎস,

অজুভেজা বদনে এসো রবের সম্মুখে,
নিজেকে ভরে তোলো মহানের সন্তোষে,
মুঠো ভরে পাও যদি তাঁর খুশি,
হবে ভাগ্যবান, জীবনে নামবে সুখের বারি।

স্বাভাবিকতই, আমার ছেলেরা যখন দশ বছরে পৌঁছে, ততদিনে তারা নামাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। কোনো বিশেষ কারণে যদি তারা মসজিদে যেতে না পারতো, তবে তারা ঘরেই নামাজ আদায় করে নিতো।

এ ছাড়াও, আমি তাদের জাগতিক ও দৈনন্দিন জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর গড়ে তুলতে উৎসাহ জুগিয়েছি। আমি তাদের বলতাম—মানুষ যত ধরনের কল্যাণ, স্বচ্ছলতা, ভালো ব্যবহার পেয়ে থাকে, তার সবই শরিয়ত অনুযায়ী জীবনযাপনের ফলে লাভ করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

"যারা ইমান এনে সৎকর্ম সম্পাদন করে, নিশ্চয় রহমান তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।" (সুরা মারয়াম: ৯৬)

অর্থাৎ, তার প্রিয় বান্দা ও আসমান-জমিনবাসীর অন্তরে।[৩৫]

তিনি আরো বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার কাজ সহজ করে দেন।" (সুরা তালাক: ৪)

আমি তাদের মাঝে দেরি করে নামাজ আদায়কারীর তুলনায় শুরুর ওয়াক্তে নামাজ আদায়কারীর সাথে আচরণে পার্থক্য প্রকাশ করতাম। আমি তাদের জন্য আমার প্রতিটি নামাজের সময় এভাবে দোয়া করতাম,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থাৎ, "তারা (দোয়ায়) বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান করুন আর মুত্তাকিদের ইমাম হিসেবে নির্বাচন করুন।" (সুরা ফুরকান: ৭৪)

৩৫. অর্থাৎ, কোনো উপায়-উপকরণের মাধ্যমে তা অর্জনের প্রচেষ্টা ব্যতীতই তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। অন্যদিকে, তাদের শত্রুদের অন্তরে আতঙ্ক তৈরি করে দেবেন। সূত্র: *ফাতহুল কাদির।*

কুরআন হেফজের দরসের সুফল (ক)

আমি আপনাদের নিকট প্রথমেই একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই—সন্তানাদিকে নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে আপনার গৃহীত সর্বপদ্ধতি সকলের ওপর কাজ করবে না। তারা সকলে একই ঘরের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আপনি সকল পদ্ধতি দ্বারা সবার থেকে ফল পাবেন না। কেননা, ছেলে-মেয়ে হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মানসিক পার্থক্যের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে।

আমার তিনটি সন্তান। আলহামদুলিল্লাহ, তারমধ্যে এক ছেলেকে তার আব্বু ছোটো থেকেই মসজিদে নিয়ে যেতেন। ফলে তখনই তার নামাজের অভ্যাস হয়ে যায়। তা ছাড়া সে যেহেতু কুরআন হেফজ করতে মসজিদে যেত, তাই কখনো-কখনো নামাজের সময় সে মসজিদেই থাকত। এটিও তার নামাজের অভ্যাসের জন্য সহায়ক হয়েছে। তার কোনো ফরজ নামাজই কখনো ছুটত না, পাশাপাশি সকল নামাজই পড়ত সে মসজিদে জামাতের সাথে।

কিন্তু আমার দ্বিতীয় মেয়েটির বয়স তেরো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে তার মতো যত্নবান ছিল না। এমনকি আমি জিজ্ঞেস বা সতর্ক না করলে সে ফরজ নামাজও ছেড়ে দিতো!! পক্ষান্তরে তার ভাইয়েরা কোনোরূপ জিজ্ঞাসা ব্যতীতই সময়মতো নামাজ আদায় করে নিতো, আলহামদুলিল্লাহ।

আমি আমার ছেলের শিক্ষকদের অবদানের কথাও ভুলব না। বিদ্যালয়ে তারা আপন শিক্ষার্থীদের দ্বীনের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন, তাদের অন্তরে দ্বীনি আনুগত্যের বীজ বপনের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। আসলে এর বেশ প্রভাব রয়েছে। শিক্ষাঙ্গন কখনো-কখনো এ ক্ষেত্রে বাড়ি থেকেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। বাচ্চারা বাবা-মাকে দেখে-দেখে ঘরে নামাজ শেখে; এরপর তারা বিদ্যালয়ে গিয়েও যখন একই চর্চা করে, তখন একসঙ্গে দুই জায়গায় একই কাজের অনুশীলন হওয়ার ফলে তাদের অন্তরে নামাজের ব্যাপারে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা হয়।

(খ)

বুঝ হওয়ার পরে নয়, বরং ছোটোকালে আট বছর বয়স থেকেই আমার সন্তানদের আমি নামাজের তাগিদ দিতে আরম্ভ করি। তাদের প্রতি আমার শঙ্কা-ভালোবাসা দুটোর কারণেই আমি তাদের নামাজের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিতাম, ভালোভাবে এর তদারকি করতাম। এ জন্য ফজরের নামাজের সময়ও আমি তাদের জাগিয়ে তুলতাম, তাদের মধ্যে বেশি ঘুমের ভাব লক্ষ করলে মুখে পানি ছিটিয়ে দিতাম। কখনো যদি কেউ নামাজ না পড়ত, তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের বাবাকে বিচার

দিতাম। তিনি নামাজের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন, এ ক্ষেত্রে কখনো শিথিলতা দেখাতেন না।

বাচ্চারা কৈশোরে পৌঁছলে আমি তাদের কুরআন হেফজের দরসে পাঠাতে শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ, তাদের কুরআন হেফজ এখন সম্পন্নও হয়ে গেছে। এরপর থেকে আমার আর তাদের তদারকির পেছনে কোনোরূপ কষ্ট করতে হয়নি। তখন তাদের বড়ো ভাই-ই ছোটোদের লক্ষ রাখত, নামাজের প্রতি সে তাদের উৎসাহিত করতো।

এখন তারা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে তাদের নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি। তাদের কেউ এখন মসজিদের ইমাম, কেউ হয়েছে মুহাদ্দিস। আলহামদুলিল্লাহ।

পরিশেষে আমি নারীসমাজের প্রতি উপদেশ দিয়ে বলব, এ ব্যাপারে আপনারা সন্তানদের সাথে একদম শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না। কারণ, তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার পর শুধু আফসোস ব্যতীত আপনাদের কোনো গতি থাকবে না।

সম্মানিত পিতা-মাতা, আপনারা সন্তানদের জন্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করুন। কেননা, অল্প বয়সি বাচ্চারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। এ ছাড়া, প্রাকৃতিকভাবে তাদের মধ্যে মনে-উদিত সকল ধরনের ইচ্ছা পূরণের প্রতিই ধাবমানতা কাজ করে থাকে, এ জন্য তারা অপর কাউকে যখন যাচ্ছেতাই বিষয়কে ভালো বলতে শোনে, তাতে লিপ্ত থাকতে দেখে, তখন তারা নিজেরাও তাকে অনুকরণ করা শুরু করে। ফলে পরবর্তী সময়ে সে ভালো মানুষদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, আলেম-ওলামাদের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা পোষণ করতে থাকে। বিপরীতে, তারা তখন পাপ ও পাপীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, বিবেকহীনদের সঙ্গলাভে আনন্দ বোধ করে, যতসব চিত্তবিনোদনের মধ্যে ডুবে থাকাকেই নিজের পরম-পাওয়া বলে ভাবতে শুরু করে।[৩৬]

৩৬. *নাদরাতুন নায়িম*: ৯/৩৭৫২।

ইকামত নয়, আজান কানে ভেসে আসার পরই আমি আমার সন্তানদের অর্থহীন বিষয়-বস্তু থেকে নিবৃত করে দেই।[৩৭] একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দেওয়ার সময় উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির প্রতি খেয়াল রাখাও আমাদের কর্তব্য। যেমন:

খাবার: নামাজের সময় তাদের খাবার দেবেন না—হয়তো পরে দিন বা আগেই খাইয়ে নিন।

ঘুম: কোনোমতেই এশার নামাজের আগে তাদের ঘুমাতে দেবেন না। নামাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তাদের ঘুমের ব্যবস্থা করুন।

পড়াশোনা: পড়তে বসার পর নামাজের ওয়াক্ত এলে খুশুখুজুর সাথে তাদের নামাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন। যে-কোনো ইবাদত, বিশেষত নামাজ আদায়ের জন্য পড়তে বসতে একটু দেরি হয়ে গেলে সময় নষ্ট করে ফেলেছে বলে তাদের জবাবদিহির সম্মুখীন করবেন না, এতে তারা দ্বীনি দায়িত্বকে জাগতিক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং, আপনি তাদের বলুন—ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগ ও ছাড় রয়েছে আমার কাছে।

বাইরে যাওয়া: প্রিয় মা, আপনি যখন মেয়েকে নিয়ে বাইরে বের হতে চান, তখন তাকে সুন্দরভাবে নামাজ আদায় করার সময় দিন। এ ক্ষেত্রে কতক মা তাদের মেয়েকে বলে থাকেন—"তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে নাও, দেরি করো না একদম, তারপর পরিপাটি হয়ে নাও!" তখন মেয়েরাও দেরি হওয়ার ভয়ে দুটো ঠুকর মেরে নামাজ শেষ করে নেয়!

প্রিয় মাতৃসমাজ, ভেবে দেখুন—মুমিন নারী হিসেবে আপনার তাড়া তো নিশ্চয় ঘর থেকে বের হওয়ার পরিবর্তে জান্নাতের দিকে বেশি! অতএব, তাড়াতাড়ি ইবাদত থেকে মুক্তি পাওয়ার বদলে নিজেকে গতিময় করে নিন আল্লাহর আনুগত্যের পথে। চিন্তা করে দেখুন, আপনার তো জানা নেই যে এই বের হওয়াই আপনাদের মা-মেয়ের শেষ বের হওয়া কি না! সুতরাং, আপনি নিজে আর আপন মেয়ের শুভসমাপ্তির কথা মাথায় রেখেই দায়িত্ব আদায় করুন।

---

৩৭. অর্থহীন বিষয়-বস্তু বলতে এখানে সে-সমস্ত বিষয় উদ্দেশ্য, যেগুলোতে স্বাভাবিকভাবে কোনো সমস্যা নেই। যেমন, ফোনে কথা বলা, পড়াশোনা, বই-ম্যাগাজিন পড়া, টিভিতে [বৈধ] অনুষ্ঠান দেখা, ঘরের কাজকারবার ইত্যাদি।

দোয়া—এক অনন্য মাধ্যম

আম্মুর কাছে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অস্ত্র ছিল, যার নাম হচ্ছে 'আল্লাহর দরবারে দোয়া'। এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে বলতে শুনেছি,

—সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, যিনি আমার ফরিয়াদ কবুল করেছেন আর আমার সন্তানদের নামাজি বানিয়ে তুলেছেন। ছোটো থাকতে আমি তাদের পেছনে এ জন্য খুব পরিশ্রম করেছি। তাদের সাথে আমি নামাজ নিয়ে কথাবার্তা বলতাম, এ জন্য তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতাম, পাশাপাশি আমি সব সময় তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েতের দোয়া করতাম। তারা যেন জুমা আর ইদের নামাজে যায়, সে-ক্ষেত্রে খুব খেয়াল রাখতাম, ফজরের নামাজের সময় জেগে ওঠার অভ্যাস করাতাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমি সফল হয়েছি, আমার কষ্ট বৃথা যায়নি। এখন তারাই আমাকে বিভিন্ন জিকির আর কুরআনের সুরা শেখাতে পারে, হাদিস শোনাতে পারে।

অতএব, আমি আমার মুসলিম বোনদের উপদেশ দিয়ে বলছি, তারা যেন তাহাজ্জুদের সময় উঠে আল্লাহর দরবারে দোয়ায় মগ্ন হয়। কারণ, (তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক) বান্দার এই সময়ের দোয়ায় তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

> "তারা (দোয়ায়) বলে—হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের নয়ন-জুড়ানো স্ত্রী-সন্তান দান করুন আর মুত্তাকিদের ইমাম হিসেবে নির্বাচিত করুন।" (সুরা ফুরকান: ৭৪)

পিতা-মাতাগণ (কল্যাণ কামনার প্রতি) দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হলে তারা নিশ্চয় আপন সন্তানের কল্যাণ ও সংশোধনের দোয়ায় মনোনিবেশ করবে। কেননা, সন্তানের সংশোধন ও কল্যাণ যেহেতু অবশেষে পিতা-মাতার কল্যাণ হয়েই ফিরে আসে, সুতরাং এই দোয়া মূলত তাদের নিজেদের জন্যই বিবেচিত হবে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা বিচার করতে গেলে, তাদের এই দোয়া মূলত সমস্ত মুসলমানেরই উপকার বয়ে আনবে। কারণ, মানুষের সৎ বংশধর থেকে স্ফুরিত কল্যাণে অন্যান্য প্রচুর মানুষেরও সংশোধন ও উপকারের কাজ হয়ে থাকে।[৩৮] (ইষৎ সংক্ষেপিত)

---

৩৮. *তাফসিরে ইবনে সাদি: ৫৩৬।*

ফোনের মাধ্যমে সন্তানের খোঁজখবর রাখা

আপনার সন্তান যখন পড়াশোনা, ভ্রমণ বা অন্য কোনো কারণে বাড়ির বাইরে থাকে, তখন নামাজের ওয়াক্ত হলে তার ফোনে কিংবা তার আশপাশের কারো ফোনের মাধ্যমে তাকে নামাজের আদেশ করুন। আপনি ম্যাসেজের মাধ্যমেও তাদের নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। এরপর পাঠানো ম্যাসেজগুলো পরবর্তী সময়ে আবার ব্যবহারের জন্য মোবাইলে সেভ করে রাখুন। তাদের পাঠাতে পারেন, নিচে তেমন কিছু ম্যাসেজের নমুনা দেওয়া হলো:

- মৃত্যু এসে যাওয়ার পূর্বেই নামাজের দায়িত্ব সেড়ে নাও।
- আমার সন্তান যদি এখনই জোহরের নামাজ পড়ে নেয়, তবে আমি খুব খুশি হব।
- আব্বু/আম্মু, নামাজের সময় হয়ে গেছে কিন্তু।
- নামাজের মাধ্যমে তোমার চেহারা, অন্তরকে আলোকোজ্জ্বল করে নাও।
- জলদি মাগরিবের নামাজ পড়ে নাও, অচিরেই আল্লাহ আমাদের জান্নাতে একত্রিত করে দেবেন।
- রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেষ বাক্য ছিল কিন্তু—নামাজ-নামাজ!
- আমার ঘরের কর্তা/আমার ঘরের আলো, নামাজ পড়তে ভুলো না যেন।
- নামাজে শিথিলতা করে অন্তরে মোহর ফেলো না!
- শুভসমাপ্তি পেতে নামাজটুকু আদায় করে নাও, আম্মু।
- নামাজ ত্যাগ করা মানে সৎকাজে তোমার তওফিকহীনতা আর মন্দ পরিণতির পরিচায়ক, অতএব সাবধান!!
- নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরের, মানুষের মন তার প্রতি বিরূপ, বিরক্ত হয়ে ওঠে; আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।
- আম্মু, তোমাকে ভালোবাসার সবচেয়ে বড়ো কারণ হচ্ছে নামাজের প্রতি তোমার যত্নশীলতা।
- আব্বু, আমি চাই না নামাজের প্রতি তোমার শিথিলতার কারণে আমাদের ভালোবাসায় ভাটা পড়ুক।
- ওঠো, এখনই নামাজের জন্য বের হও! তার সাথে শুভ পরিণতির সুসংবাদ গ্রহণ করো।
- হায়-হায়, তোমাকে পেছনে ফেলে চলে গেছে! কে তারা?! যারা ইতোমধ্যে নামাজের জন্য মসজিদে চলে গেছে! তবে যাও, তাড়াতাড়ি ধরো তাদের!

নামাজের ওয়াক্ত হলে আপনার নিজের সন্তান ছাড়া আপন আত্মীয়স্বজনের নিকটও এগুলো পাঠাতে পারেন। যেমন: ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামা, খালা প্রমুখ। এতে তাদেরও কল্যাণের অংশীদার হতে সহযোগিতা করা হলো।

নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তাঁকে দেখার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। এ ছাড়া সে এমন একটি বিষয় থেকেও বঞ্চিত হলো, যা তার গুনাহ মাফের কারণ হতো আর তার নেকিগুলো বাড়িয়ে তুলতে পারতো।

তড়িৎ অভিজ্ঞতাসমূহ

১

আমার সবগুলো সন্তানই তেরো বছরের কম বয়সের। তাদের আমি নামাজের অভ্যাস করিয়েছি। আল্লাহর সামনে তাদের জবাবদিহি করতে হবে বলে তাদের চেতনা জাগ্রত করেছি। আমি তাদের বলতাম—আমি তোমাকে নামাজের তাগাদা দিয়েছি। এবার অচিরেই তোমাকে এ জন্য জবাব দিতে হবে। মনে রেখো, তোমার জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হয় কি না, এ নিয়ে আমার বড়ো দুশ্চিন্তা।

২

ঘোরাফেরা বা রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে আমরা বাড়ির বাইরে গেলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চেষ্টা করি, যেন আমার সন্তানরা সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়তে পারে এবং ফজরের সময় জেগে ওঠা তাদের জন্য সহজ হয়। আমি তাদের উৎসাহ দিয়ে বলি—মসজিদে যাওয়ার ফলে কদমে-কদমে তোমাদের নেকি হয়। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "অন্ধকার রাতে মসজিদে গমনকারীদের কেয়ামতের দিন পূর্ণ আলোকপ্রাপ্তির সুংবাদ দাও।"

৩

সন্তানদের নামাজের তাগিদ দেওয়ার ব্যাপারে আমি খুব দৃঢ়, এ ক্ষেত্রে আমার মধ্যে কোনোপ্রকার শিথিলতা নেই। আমি আমার স্ত্রীকেও এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গভাবে আমায় সহযোগিতার জন্য উৎসাহিত করে থাকি।

বাচ্চাদের নামাজের ওপর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমার সার্বক্ষণিক ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি হচ্ছে, তারা যখন নামাজ আদায় করে, তখন আমি তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বুঝতে দেই যে আমি তাদের কাজে খুশি হয়েছি। এ ছাড়া আমার প্রতিবেশীদের আমি বলি যে তারা যেন আমার বাচ্চাদের উৎসাহিত করে। যেমন, সালাম দিয়ে আপনারা তাদের একটু গুণগান করবেন, ধন্যবাদ দেবেন, নামাজে যত্নবাদ হওয়ার জন্য উদ্দীপনা জোগাবেন।

৪

আমার সন্তানদের মধ্যে যে নামাজ পড়ে, তার প্রতি আমার বিশেষ আদর ও মূল্যায়ন থাকে। যেমন, তাকে নিয়ে আমি বাইরে যাই, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে পরামর্শ দিতে বলি, তার যৌক্তিক আবদারগুলো পূরণ করি, ঘরে তার জন্য বিশেষ একপ্রকার মূল্যায়ন রাখি ইত্যাদি। আমার গৃহীত এই পদ্ধতি আমার সন্তানদের নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

৫

মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব যখন 'আল্লাহু আকবার' বলে আজান শুরু করেন, তখন আমি আমার সন্তানদের বলি, তারা যেন হাতের সমস্ত কাজ গুছিয়ে এবার নামাজের প্রতি মনোনিবেশ করে। তাদের আরো বলি: আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে বড়ো, তদ্রূপ তার আদেশও সবকিছু থেকে বড়ো।
তাদের কেউ যদি কখনো দ্রুত নামাজ আদায় করে ফেলে, তখন আমি তাদের বলি: নামাজে খুশুখুজু ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আমার মেয়েরা এখন আল্লাহর রহমতে কুরআন হেফজ করছে। তাদের কেউ যদি কখনো নামাজ ছেড়ে দেয়, তবে তাকে বলি—নামাজই যদি ছেড়ে দাও, তবে কুরআন মুখস্থ করে তোমার কোনো লাভ নেই।

৬

আমি আমার সন্তানদের কুরআনের সে-সমস্ত আয়াত তেলাওয়াত করে শোনাই, যেখানে আল্লাহর আনুগত্যে উদাসীনতা প্রদর্শনের কারণে কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আমি তাদের বলি, নামাজে অলসতা করা হচ্ছে মুনাফিকদের আলামত, আর মুনাফিকরা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাহান্নামের অধিবাসী!

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে, অথচ আল্লাহই তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়; তারা মূলত মানুষকে তাদের নামাজ দেখায় আর সেখানে আল্লাহর স্মরণ করে থাকে অল্পই।" (সূরা নিসা: ১৪২)

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা যখন সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামাজে দাঁড়ায়, তখন অলসতা নিয়ে, নামাজকে বোঝা মনে করে আর বিরক্তির সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, অলসতা সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে অন্তরে নামাজের প্রতি আগ্রহ-আকর্ষণ না থাকা। সত্য বলতে, তাদের অন্তর যদি আল্লাহ আর তাঁর নেয়ামতের প্রতি আকর্ষণহীন না হতো, অন্তরে ইমানশূন্যতা বিরাজ না করতো, তবে তাদের থেকে কখনোই এরূপ অলসতা প্রকাশ পেত না।[৩৯]

৭

আমার সন্তানরা যখন দেখে, তাদের বাবা ঘরে সুন্নত নামাজ পড়ছেন, তখন তারা বুঝতে পারে যে এর খুব গুরুত্ব রয়েছে। আমিও আজান শোনার পর আমার হাতে যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন, তা রেখে নামাজের প্রতি মনোযোগী হই। এর মাধ্যমে আমি মূলত তাদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাই যে নামাজই হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আমি আমার সন্তানদের কখনো অন্যান্য ছেলে-মেয়ের সাথে তুলনা করে দেখাই না। এতে তাদের নিজেদের ব্যাপারে অপূর্ণতার অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে, যা তাদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৮

জনৈক ব্যক্তি সন্তানদের সাথে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি তাদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর আশ্রয় নিয়েছিলাম:

- পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মানসিকতা সৃষ্টি করতে আমি তাদের বলতাম, তোমাদের মধ্যে কে বেশি জান্নাতে যেতে চাও, বলো তো দেখি?
- আল্লাহর ভয় দেখাতাম, তিনি তাদের সর্বাবস্থায় দেখছেন, তা বোঝাতাম।

---

৩৯. *তাফসিরে ইবনে সাদি*: ১৭৪।

• অজুর ফজিলত আর তার পাপ মোচনের ক্ষমতার কথা শোনাতাম।

• আমি নিজে তাদের জন্য আদর্শ হতে চেষ্টা করতাম।

• সব নামাজ, বিশেষ করে ফজরের জন্য তাদের জাগিয়ে দিতাম আর ছেলেদের সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যেতাম।

• মেয়েদের নামাজের অভ্যাস করানোর জন্য তাদের মা ঘরে তত্ত্বাবধায়িকার দায়িত্ব পালন করতেন।

কুরআনে এসেছে,

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আর আমার পিতা-মাতার ওপর আপনার দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তওফিক দান করুন এবং আমি যেন আপনার সন্তুষ্টিজনক সৎ আমল করতে পারি, সেই তওফিকও। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনার কাছে তওবা করছি আর আমি নিশ্চয় আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা আহকাফ: ১৫)

লক্ষ করুন, দোয়াকারী যখন নিজের কল্যাণের জন্য দোয়া করছেন, সেখানে আপন সন্তানদের কল্যাণ-সংশোধনের বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছেন। কেননা, বংশধরদের কল্যাণ প্রকৃতপক্ষে পিতা-মাতার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। (ঈষৎ সংক্ষেপিত)[৪০]

৯

আমার সন্তানদের যখন আমি নামাজের জন্য জাগ্রত করি, তখন প্রত্যেকের হাত ধরে খাট থেকে নামতে সাহায্য করি আর অজু করার জন্য পানির কাছে পৌঁছে দেই। এরপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। তারপর পানির পরশে যখন তাদের মধ্যে সতেজতা ফিরে আসে, তখন তাদের নামাজের নির্দেশ দেই।

১০

৪০. *তাফসিরে ইবনে সাদি*: ৭২৬।

আমার দুই মেয়ের বয়স যথাক্রমে সাত আর চার বছর। আমি যখন নামাজ পড়তে প্রস্তুত হই, তখন জায়নামাজ হাতে তাদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দেওয়ার ঢঙে ডেকে বলি—তোমরা কে আমার মতো নামাজ পড়তে পার শুনি তো? এরপর আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য কেনা আলাদা-আলাদা রঙের আচ্ছাদনগুলো আর দুটো জায়নামাজ এনে দেই। তখন তারা খুশি-আনন্দের সাথে নামাজে দাঁড়াতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। আবার কখনো দেখা যায়, বিনা আদেশেই তারা অজু করে নামাজ পড়ে নিয়েছে।

একরাতের ঘটনা। আমার এক মেয়ে তাহাজ্জুদের সময় আমার সাথে জায়নামাজে বসে গেল, এরপর নামাজ পড়ল। নামাজের পর ইসতেগফার পড়ে দোয়ায় বারবার বলতে লাগল, 'ইয়া রাব্বি, আল-জান্নাহ; ইয়া রাব্বি, আল-জান্নাহ' (হে আল্লাহ, জান্নাত দিন; হে আল্লাহ, জান্নাত দিন)। বস্তুত, এরকম ঘটার পেছনে আল্লাহর দয়ার পরেই রয়েছে আমাকে ঘন-ঘন নামাজ পড়তে দেখা।
ইবরাহিম বিন শাম্মাস বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ছোটোকাল থেকেই রাতভর ইবাদতে লিপ্ত থাকতো বলে জানি।[৪১]

১১

আমার পরিবারের শিথিলতা আর অবহেলার কারণে আমি আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নামাজ পড়িনি! এ ছিল আমার জন্য বিরাট একমুসিবত। তাই আমি আমার সন্তানদের প্রত্যেক ওয়াক্তে শক্তভাবে নামাজের তাগিদ দেই, যেন তাদেরও আমার মতো অবস্থা না হয়। আমার সন্তানরা যেন আমার সাথেই সময়মতো প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে নেয়, সে ব্যাপারে আমি খুব গুরুত্ব প্রদান করি। আলহামদুলিল্লাহ, এখন তারা মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়ে।

১২

আমি একজন মহিলা। আমার পাঁচ সন্তান। আলহামদুলিল্লাহ, তারা প্রত্যেকেই এখন মসজিদের ইমাম।
সংক্ষেপে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আমি ছোটো থেকেই তাদেরকে পরিচিত সব পদ্ধতি—যেমন উৎসাহ, ভয়, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নামাজের আদেশ করতে শুরু করি। এ ক্ষেত্রে আমার স্বামী আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন। তাঁর উপমা হতে পারে এক হাতের জন্য অপর হাতের উপমা। আমি যখন কোনো সন্তানের ওপর কঠোর হতাম, তখন তিনিও আমার সাথে কঠিন হতেন। অনুরূপ, আদুরে আচরণের ক্ষেত্রেও তিনি আমার মতো নরম আচরণ করতেন। এতে তারা

---

৪১. *আদাবুশ শারইয়্যাহ লি-ইবনি মুফলিহ*: ২/১৬৯।

বুঝতে পারতো যে আমরা তাদের সাথে একই আচরণ করব, ফলে তাদের মধ্যে বেশ সুপ্রভাব পড়ে।

তাদের নামাজের অভ্যাস করানোর জন্য আমি আরো নানানভাবে চেষ্টা চালিয়েছি। যেমন, তাদের মধ্যে যে নামাজে অবহেলা করতো, আমি তার সাথে কথা বলতাম না। কিন্তু তার আবেগকে নাড়া দেওয়ার জন্য আর তার মধ্যে অনুতাপ সৃষ্টির জন্য অন্যদের সাথে ঠিকই কথাবার্তা চালিয়ে যেতাম। তাকে জড়িয়েও ধরতাম না। তাদের দশ বছর হওয়ার পর প্রয়োজনের মুহূর্তে আমি প্রহারেরও শরণাপন্ন হই।

১৩

আমার বাচ্চার পিচ্চিকাল থেকেই আমি তার কানে কালিমায়ে শাহাদাতের ধ্বনি শুনিয়েছি। আমি তার কানে-কানে প্রশ্ন করতাম, মানুষকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করেছেন বলো তো দেখি? এরপর আমি নিজে নিজেই এই আয়াত পড়ে উত্তর দিতাম,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জিন এবং মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (সুরা জারিয়াত: ৫৬)

তার সাথে আমি জান্নাত নিয়েও অনেক কথা বলতাম। বলতাম, সে যা-যা পছন্দ করে, তার সবকিছুই আছে জান্নাতে।

সে যখন আগুন দেখত বা গরম কোনো জিনিস স্পর্শ করতো, তখন আমি তাকে জাহান্নাম আর নামাজ ত্যাগকারীর শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম।

তাকে বলতাম—তুমি যদি নামাজ ছেড়ে দাও, তবে তোমার হাশর হবে কাফেরদের সাথে। আমি আমার কথা শেষ করতে পারতাম না, এরমধ্যেই সে অজু করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, নামাজের সময় হবে কখন?

১৪

আমার ছেলে এগারো বছর বয়সে পৌছার পর মসজিদে যাওয়া ছেড়ে দেয়। অথচ আমি তাকে সাত বৎসর বয়স থেকেই নামাজে যত্নবান হতে উৎসাহ দিয়ে আসছি! এরপর তাকে আমি প্রচুর চাপ ও ধমক দেওয়া শুরু করি, তার পছন্দের বিষয়াদি থেকে তাকে বঞ্চিত করার ভয় দেখাতে থাকি। এখন সে মসজিদে যাচ্ছে বটে, তবে সেটিও তার পেছনে লেগে থাকার পর।

১৫

আমি নামাজ পড়ার সময় আমার ছোটো বাচ্চাকে আমার পাশে দাঁড় করিয়ে দিতাম, তখন সেও আমার মতো রুকু, সেজদা করতো।

সে যতবার আমাকে নামাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে, আমি প্রত্যেকবারই জীবনঘনিষ্ঠভাবে বাস্তবধর্মী প্রমাণ ও উদাহরণের সাথে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। আমি তাকে এভাবে বলতাম—কারণ, আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের স্রষ্টা, রিজিকদাতা, জীবন দানকারী, মৃত্যু প্রদানকারী; তিনিই হচ্ছেন ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত, এ জন্যই আমরা তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি। মনে রেখো, আমাদের সকল কিছু তাঁরই হাতে, তিনিই আমাদের সৌভাগ্যদাতা, জীবিকা নির্বাহকারী, অবস্থার সংশোধনকারী।

এ ছাড়া, আমি তার কাছে আল্লাহর বড়োত্ব, আমাদের জন্য তাঁর ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তা, আমাদের থেকে তাঁর অমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদির বিভিন্ন বাস্তবধর্মী উপমা-উদাহরণও শুনিয়ে যাই। অবশেষে আমার সন্তান যত্নবান নামাজি একটি ছেলেতে পরিণত হয়েছে।

১৬

নিয়মিত নামাজ পড়তে থাকার পর আমার ছেলে একপ্রকার অলসতা দেখাতে শুরু করে। তখন আমি প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানের শরণাপন্ন হই। আমি তাকে বলতাম—তোমার যদি জোহর, মাগরিব বা এশার নামাজ কাজা হয়, তবে এ পরিমাণ হাতখরচ কাটা যাবে; আর যদি ফজর বা আসরের নামাজ কাজা করো, তবে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ কাটা যাবে। এ দুটোর কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হচ্ছে, এগুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে শরিয়তের বাণী রয়েছে। আল্লাহর রহমতে একসময় আমার ছেলে নামাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, এরপর থেকে মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামাজ পড়াই তার কাছে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়!

১৭

আমার গৃহীত পদ্ধতিগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- যে ফজরের নামাজ পড়বে না, আমি সেদিন সারাদিন তার সাথে কথা বলব না।
- তারা নামাজের জন্য না জাগলে, আমার ডাকাডাকিতেও তাদের ঘুম না ভাঙলে, তখন আমি রুমের এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে দিতাম, ফলে গরম অনুভবের পর তারা নামাজের জন্য জেগে উঠত।

১৮

আমি আমার কিশোরী মেয়ের সাথে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, প্রহার, কটুবাক্য ইত্যাদির বদলে চুমু, ভালো কথা, দোয়া ইত্যাদি ব্যবহার করেছি।

১৯

আমি আমার সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে মসজিদে নিয়ে যেতাম। ফলে আমার সাত বছরের ছেলে যখনই দেখত যে আমি ঘর থেকে বের হচ্ছি, তখন জিজ্ঞেস করতো—আব্বু, তুমি কি মসজিদে যাচ্ছ? মানে, সে আমার সঙ্গে যেতে চায়।

প্রশ্ন: বাচ্চাদের মসজিদে প্রবেশের হুকুম কী?

উত্তর: সাত বা তারচেয়ে বেশি বয়সি বুঝমান বাচ্চারা যখন তাদের অভিভাবকের সঙ্গে বা একাকী অবস্থায় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে আসে, সে-ক্ষেত্রে তাদের বাধা দেওয়া যাবে না।[৪২]

---

৪২. *ফাতাওয়াল লাজনাতুদ দায়িমাহ:* ৬/২৭৫।

- কবরে সে মর্মান্তিক আজাবের সম্মুখীন হবে। যেমন, বেনামাজি ব্যক্তির আজাব নিয়ে পূর্বে নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে।
- নামাজ ত্যাগকারীদের পাপী ও দুরাচারীদের সঙ্গে জাহান্নাম-বাস হবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী। তবে ডানপাশের ব্যক্তিরা ছাড়া, তারা থাকবে জান্নাতে। তারা অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা জাহান্নামে গেলে কীভাবে? তারা উত্তরে বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না।" (সুরা মুদ্দাসসির: ৩৮-৪৩)

- নামাজত্যাগী ব্যক্তি পরিজন আর সমস্ত ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলা থেকেও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যার আসরের নামাজ ছুটে গেল, সে যেন তার পরিবার-পরিজন আর ধনসম্পদ [সবকিছু] হারিয়ে ফেলল।"[৪৩]
এবার ভেবে দেখুন, যার সমস্ত নামাজই ছুটে যায়, তার কী অবস্থা!!
- কেয়ামতের দিন তাকে 'গায়্যা'-তে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

"তাদের পর এমন উত্তরসূরী এলো, যারা নামাজ ধ্বংস করল, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলল। অতএব, অচিরেই তারা 'গায়্যা'-এর সাক্ষাৎ পাবে। তবে যারা তওবা করে ইমান এনেছে আর সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তারা এর ব্যতিক্রম হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচারের সম্মুখীন হবে না।" (সুরা মারয়াম: ৫৯-৬০)

৪৩. *সহিহ মুসলিম*: ৬২৬।

গায়্যা-এর পরিচয়

এটি হচ্ছে পুঁজ ও রক্তের সংমিশ্রণে বিস্বাদ জাহান্নামের অতি গভীর একগহ্বর।

ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তারা নামাজ ধ্বংস করেছে বলতে পরিপূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং ওয়াক্তমতো না পড়ার কথা বলা হচ্ছে।

সাইদ বিন মুসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে [ঢিলেমি করতে-করতে] আসরের সময় জোহর পড়ে, মাগরিবের সময় আসর পড়ে, এশার সময় মাগরিব পড়ে, ফজরের সময় এশা পড়ে আর সূর্য উঠে গেলে ফজরের নামাজ আদায় করে। অতএব, সে যদি তওবাহীনভাবে এই অবস্থায় মারা যায়, তবে আল্লাহ তাকে 'গায়্যা' দ্বারা শাস্তি প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করছেন।

তার এই পাপ আল্লাহর নিকট মানুষ হত্যা, অন্যের সম্পদ গ্রাস, ব্যভিচার, চুরি, মদপান সবকিছু থেকেই মারাত্মক। সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর শাস্তি, অসন্তোষ আর লাঞ্ছনার শিকার হবে।[৪৪]

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য সেজদা করবে, সে আখেরাতেও তাঁকে সেজদা করার সৌভাগ্য পাবে। আর যে এখানে তাঁকে সেজদা করবে না, সে ওখানেও তা থেকে বঞ্চিত হবে।" যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

"যেদিন 'সাক' উন্মুক্ত হবে এবং তাদের সেজদার জন্য ডাকা হবে, সেদিন তারা তাতে সক্ষম হবে না।" (সূরা কলম: ৪২)

তাদের অক্ষমতার কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

"ইতিপূর্বে সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের সেজদার জন্য ডাকা হয়েছিল।" (সূরা কলম: ৪৩)

অতএব, দুনিয়াতে ভালো-সুস্থ থাকাবস্থায় যেহেতু তারা নামাজ ত্যাগ করেছিল, তাই সেজদা করার সক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। সুতরাং, দুনিয়াতে যারা মুনাফিকি করে বা লোক-দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য আল্লাহকে সেজদা করেছে, কেয়ামতের দিন তাদের পিঠ সোজা হয়ে থাকবে। যখনই তারা সেজদা করতে যাবে, তখন সোজা মাটিতে পড়ে যাবে।"

---

৪৪. ইবনে উসাইমিন রচিত *হুকমু তারিকিস সলাতি ওয়া-ফিতানুল মাজাল্লাত* এবং ড. সালেহ ফাওযান রচিত *আস-সলাত: আহাম্মিয়্যাতুহা ওয়া-ফাদলুহা*।

পরিশিষ্ট

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিন বান্দারা, তোমরা সবর করো, তাতে প্রতিযোগিতা করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা সফল হতে পার।" (সুরা আলে ইমরান: ২০০)

অতএব, আপনার সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করাতে গিয়ে কষ্টকর যে-সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে-সব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করুন। কোনো ধরনের বিরক্তি ও অবসাদকে গুরুত্ব না দিয়ে আল্লাহর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে স্থিরচিত্ত ও দৃঢ়তার সাথে ধৈর্যের পরিচয় দিন। ইসলামের ওপর অবিচল থাকতে গেলে যে-সমস্ত কষ্ট-যন্ত্রণা আসে, সে কথা স্মরণ করে সবরে ব্রতী হোন। আপন নফসকে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর বাধ্য করা এবং হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখার একান্ত প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চেষ্টা করে যান। বস্তুত, সবর প্রতিটি মুমিনের জন্যই অপরিহার্য একবিষয়। এটি ছাড়া কখনোই সে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর অটল-অবিচল থাকতে সক্ষম হবে না।[৪৫]

সারকথা, উল্লিখিত প্রতিটি অভিজ্ঞতাই আপনাকে এ ক্ষেত্রে সবর ও অবিচলতার সাথে কার্যসম্পাদনের শিক্ষা দেয়। কেননা, আপনার অধ্যাবসায়হীন চেষ্টার কারণে আপনার সন্তান যদি নামাজের প্রতি শিথিলতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে যে সে মারাত্মক ঝুঁকিতে পতিত হলো!

মনে রাখবেন, শুরুতেই যদি আপনি আপনার সন্তানের খারাপ অভ্যাসগুলোর লাগাম টেনে না ধরেন, তবে তার চূড়ান্ত পরিণতি হবে এমন বৃদ্ধের ন্যায়, যিনি লাঠি ধরে টুকটুক করে হেঁটে গেলেও অবশেষে তার গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছে যায়—(অর্থাৎ, বাচ্চাদের বদ-অভ্যাসগুলোও আস্তে-আস্তে একসময় প্রকট রূপ ধারণ

---

৪৫. *সফওয়াতুল আছারি ওয়াল-মাফাহিম মিন তাফসিরিল কুরআনিল আজিম*: ৪/৫১৪।

করবে)। আপনার আশপাশেই এমন অনেক যুবক-যুবতী দেখতে পাবেন, যারা মোটেও নামাজ পড়ে না! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আরো মনে রাখবেন, শেষ পর্যন্ত আপনার সন্তান নিজে থেকেই আপন দায়িত্ব বহনে সক্ষম হবে। কিন্তু এখন যদি আপনি তাকে বহন না করেন, তবে কে তাকে বয়ে নিয়ে যাবে?!

বস্তুত, সিড়ি একটি-একটি ডিঙিয়েই ওপর তলায় পৌঁছা যায়। অতএব, সিঁড়ি ব্যবহার করুন, লাফিয়ে কার্যসম্পাদনে রত হবেন না—এতে আপনি ও আপনার সন্তান উভয়ই নিচে পড়ে যাবেন।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তার ছাত্রকে বললেন—বড়ো একটি উটও তুমি একা খেয়ে ফেলতে পারবে, যদি ওটাকে ছোটো-ছোটো করে কেটে নাও আর প্রত্যেকদিন এক টুকরো করে খাও।

এই বাণী থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি, আপনি আপনার সন্তানকে যেভাবে গড়ে তুলতে চান, সে-জন্য আপনাকে তার বয়স অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মোটকথা, নিজের মহৎ কোনো ভাবনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে যত্নশীলতা অবলম্বন জরুরি। মনে রাখবেন, কোনো বড়ো বিষয়ই উদ্যম-উদ্দীপনা ব্যতীত অর্জিত হয় না। আর নিজের সন্তানদের নামাজের যত্ন নেওয়ার বিষয়টি আপনার আর তাদের উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একবিষয়!

তাদের নামাজের অভ্যাস করানোর ক্ষেত্রে 'সময় নেওয়া' ও 'সবর করা', এ বিষয় দুটি হচ্ছে আপনার গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। পাশাপাশি, ঠিকঠাকভাবে সন্তানদের মানসিকতার পার্থক্য নির্ণয় করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারাও আপনার কার্যসম্পাদনে সহায়ক হবে। খেয়াল রাখতে হবে, জীবনের এই ময়দানে আছে স্বাভাবিকতা ও জটিলতা, সাম্য ও বক্রতা আর উচ্চতা ও নিম্নতার দ্বিমাত্রিকতা। তো, মানুষ যাদের নিয়ে বাঁচে, দেখভাল করে, তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ প্রকারটি হচ্ছে তাদের সন্তান। অতএব, প্রথমে আপনি তাদের মানসিকতা আর রুচিবোধের ভিন্নতা বুঝতে চেষ্টা করুন। এরপর শরয়ি ক্ষেত্রে কোনোরূপ শিথিলতা প্রদর্শন ব্যতীত সবচেয়ে সহজ ও উপযোগী পন্থা ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করুন। আশা করি, আল্লাহ আপনাকে সহযোগিতা করবেন এবং কল্যাণের প্রতি তাদের শরহে সদর করে দেবেন।

সমস্ত প্রশংসাই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যিনি আমায় তওফিক আর হেদায়েত দিয়েছেন। এই বইয়ে যা-কিছু শুদ্ধ আছে, তার সবটুকুই একক আল্লাহর পক্ষ থেকে—তিনিই তো আপন বান্দাদের ওপর দয়া করে থাকেন। আর যদি কিছু

অশুদ্ধ থেকে থাকে, তবে তা আমার নিজের আর শয়তানের পক্ষ থেকে—আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এর দায় থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত।

আল্লাহ্ আমাদের প্রিয়নবি এবং তাঁর পরিজন ও সাথিসঙ্গীদের ওপর রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।[৪৬]

---

৪৬. উল্লেখ্য, পাঠকের সুবিধার্থে উল্লিখিত অভিজ্ঞতাগুলোর সারসংক্ষেপ হিসেবে ছোটো আরেকটি পুস্তিকা রচনা করেছেন সংকলক, যেটির সরল অনুবাদ, 'সন্তানদের নামাজের অভ্যাস করানোর ৯২টি পদ্ধতি'। সেখানে তিনি এই পুস্তিকার নির্যাসসহ আরো কিছু বর্ধিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। আমরা সেটিরও অনুবাদ সংযুক্ত করেছি এই অনুবাদে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে শুরু হচ্ছে। (অনুবাদক)

সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করানোর ৯২টি পদ্ধতি

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং আমাদের প্রিয়নবিজি আর তাঁর পরিজন ও সাথিসঙ্গীদের ওপর বর্ষিত হোক রহমত ও শান্তির ধারা।

পরসমাচার,

আপনার সম্মুখস্থ পুস্তিকাটি হচ্ছে আমার সংকলিত রচনা *তাজারুবুন লিল-আবায়ি ওয়াল-উম্মাহাত ফি তায়িদিল আওলাদি আলাস সলাত* (পূর্বে গত রচনা)-এর সংক্ষিপ্তসার। সেখানে আমি আলোচ্য বিষয়ের ওপর বিভিন্ন বাস্তব অভিজ্ঞতা একত্র করেছিলাম। তবে তা থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণের ব্যাপারটি পাঠকের ওপরই ছেড়ে দেই। তবে এখন আমার আনন্দ লাগছে, এখানে আমি আপনাদের সামনে সেই অভিজ্ঞতাগুলোর উপকারী সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, এখানেও আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমি যতবার সন্তান শব্দ ব্যবহার করব, তার প্রতিটিতেই ছেলে-মেয়ে, আবার কখনো বড়ো-ছোটো সকলেই আমার উদ্দীষ্ট হবে। তাহলে চলুন, শুরু করা যাক।

হানা সনি
রিয়াদ, ১৪২৬হি.

৯২টি পদ্ধতি

১

সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করানোর চেষ্টা-পরিশ্রমে আপন অন্তরকে ইখলাসপূর্ণ রাখুন, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সফলতা কামনা করুন। এতে আপনার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপন কর্তব্য পালনে নিজের মধ্যে পাহাড়সম অটলতা-অবিচলতা খুঁজে পাবেন। ফলে, কোনো ঝঞ্ঝা-প্রলয়ও আপনাকে টলাতে সক্ষম হবে না।

২

তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করুন, মৃত্যুর ফেরেশতা যে-কোনো সময় দরজায় এসে দাঁড়াতে পারেন।

৩

প্রতিবেশীরা পারস্পরিক সহযোগী হয়ে উঠুন। কখনো আপনি তাদের সন্তানদের মসজিদে নিয়ে যান, আবার কখনো তারা আপনার সন্তানকে নিয়ে যাক। প্রতিবেশী বাচ্চাদের বাবা অনুপস্থিতকালে আপনি তাদের খেয়াল রাখুন। পাশাপাশি আপনার অনুপস্থিতিকালে বা নামাজের সময় আপনার বাচ্চাদের রাস্তায় খেলাধুলা করতে দেখলে তারাও যেন খেয়াল রাখে, সে ব্যাপারে কথা বলুন।

৪

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

"সে কি জানে না যে আল্লাহ তাকে দেখছেন!" (সুরা আলাক: ১৪)

আপনি যদি আপনার বাচ্চাদের মানসিকতা এই আয়াতের আলোকে গড়ে তুলতে পারেন, তবে তারা আপনার অনুপস্থিতির সময়ও নামাজ আদায় করবে। কারণ, আপনি তাদের মধ্যে ইখলাসপূর্ণ ইবাদতের বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে তাদের ভেতর সত্তাগত একপ্রকার সিকিউরিটি সিস্টেম সক্রিয় করে দিয়েছেন। তাই তারা কখনো আর আপনার ভয়ে নামাজ পড়বে না; বরং তাদের নামাজ হবে একমাত্র আল্লাহর প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভীতিপূর্ণ আবেগের সংমিশ্রণে।
আপনাকে সতর্ক করে বলছি, আপনি সে-সকল মানুষের মতো হবেন না, যারা সন্তানকে নিজের ভয় দেখিয়ে নামাজে দাঁড় করায়, অথচ ধারণা করে যে এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানখেয়াল সৃষ্টি হচ্ছে! প্রকৃতপক্ষে, তাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা কেবল পিতার উপস্থিতিতেই নামাজে দাঁড়ায়, অন্যথায় নয়। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এখানে অনেকেই ভুল করে থাকে।

অতএব, আপনার প্রতি উপদেশ হচ্ছে, আপনি নিজের বদলে আল্লাহর সাথে বাচ্চাদের সম্পর্ক জুড়ে দিতে চেষ্টা করুন।

৫

সন্তানের সামনে কখনো তার সংশোধনের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করবেন না, এতে তার অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য আপন রবের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ বলেও বিবেচিত হয়, যা মূলত তাওহিদের বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত ও তাঁর সাহায্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, সে আপন প্রতিপালকের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করল।”

৬

পিতা-মাতা বা বড়ো ভাই-বোনেরা ঘরোয়াভাবে ইলমি আলোচনা ও নসিহতের মজলিস কায়েম করুন। তা সপ্তাহে আধা ঘণ্টা করেও হতে পারে, কিন্তু অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে হতে হবে। কারণ, নিয়মিত অল্প কিছুও অনিয়মিত অনেক কিছু থেকে উত্তম। ইনশাআল্লাহ, আপনার সন্তানদের মধ্যে এই আলোচনা-মজলিসের সুফল দেখতে পাবেন।

৭

কর্মব্যস্ততা, ভ্রমণ, হাসপাতালে ভর্তি, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদির কারণে যেই পিতা সন্তানদের থেকে দূরে অবস্থান করছেন, তিনি যেন ফোনের মাধ্যমে তাদের তদারকি চালিয়ে যান। এতে তারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। হ্যাঁ, বাস্তবেই এমন কিছু পিতা রয়েছেন, যারা বাড়ি থেকে দূরে থাকাকালীন ফোনের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের নামাজের খোঁজখবর নিয়ে থাকেন।

৮

তাদের মন্দ পরিণতির ভয় দেখান, শুভ সমাপ্তির প্রতি উৎসাহ দিন।

৯

খুব গুরুত্ব দিয়ে নামাজের আদেশ করুন এবং সার্বক্ষণিক তাদের খেয়াল রাখুন। কখনো পড়ে, কখনো পড়ে না—এমন করতে দেবেন না।

১০

সন্তানদের আখেরাতমুখী করে তুলতে সর্বাবস্থায় তাদের সামনে জাগতিক বিষয়াদির তুলনায় পরকালীন বিষয়াবলি প্রাধান্য দিন। তাদের বোঝান—হোমওয়ার্ক করা থেকে সময়মতো নামাজ পড়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ; অন্যের থেকে একবার ফুটবল বাগিয়ে আনার তুলনায় জামাতে গিয়ে এক রাকাত নামাজ পাওয়া বেশি গুরুত্ববহ; বন্ধুদের সময় দেওয়া, ফোনে কথা বলা, টিভিতে প্রোগ্রাম দেখা ইত্যাদির চেয়ে নামাজের সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা অধিক লক্ষণীয়।

১১

সন্তানের সাথে অভিমান, সম্পর্কচ্ছেদ যদি নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে উপকারী হবে মনে করেন, তবে তা করতে পারেন; অন্যথায় এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে যাবেন না।

১২

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করুন এবং তাদের পরামর্শ-অনুরোধ জানান, তারা যেন আপন শিক্ষার্থীদের সাথে সব সময় নামাজের গুরুত্ব আর তা ত্যাগের শাস্তির ব্যাপারে কথা বলেন; শিক্ষার্থীরা নামাজ আদায় করেছে কি না, সে ব্যাপারে যেন প্রশ্ন করেন। এ ক্ষেত্রে তারা প্রতিদিন তিনটি করে শিক্ষার্থীকে ফজরের নামাজ পড়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যা তাদের জন্য নিতান্তই সহজ।

১৩

আপনার শিশু বাচ্চাদের জন্য কিছু রঙবেরঙা বই কিনে আনুন। যেগুলোতে ছবিসহ অজু, নামাজের পদ্ধতি চিত্রিত থাকবে, আবার কিছু দোয়াদুরুদও থাকবে।

১৪

সন্তানরা নামাজ আদায়ের পর পিতা-মাতা যদি তাদের একটু জড়িয়ে ধরে, চুমু খায়, কাঁধে হাত রেখে পাশে টেনে নেয়, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, মানসিক আদর-সোহাগ প্রকাশ করে, তাহলে তারা নামাজের প্রতি যতটুকু উৎসাহ পায়, তা হাজারো উপহার-উপঢৌকনের মাধ্যমেও সম্ভব নয়।

১৫

ছেলে-মেয়েদের ঘুম থেকে জাগানোর ক্ষেত্রে কি আপনি বিরক্ত হয়ে পড়েছেন? চিন্তার কিছু নেই, নিচের পদ্ধতিগুলো কাজে লাগিয়ে দেখুন:

- আদর করে ডাকুন।

আস্তে করে পিঠে, মাথায় হাত বোলান।

- তাকে আনন্দের কোনো কথা শোনান, এতে তার ঘুম চলে গিয়ে সে সতেজ হয়ে উঠবে। যেমন বলতে পারেন:
  : আজ কিন্তু তোমাকে অমুক জায়গায় নিয়ে যাব!
  : জানো, আজ তো অমুক আসবে!
  : তুমি তো পাশ করেছ!
  : এই, তোমাকে অমুক ফোন করেছে।
- একবার ডাকার পর আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে দিন, কিছুটা বিরতি দিয়ে আবার ডাকুন।
- এসি বন্ধ করে দিন।
- লাইট জ্বালিয়ে দিন।
- প্রয়োজনে মুখে পানির ছিটা দিন। খেয়াল করুন, শুধুই পানির ছিটা।
- তাকে শুনিয়ে তার জন্য মঙ্গলের দোয়া করতে-করতে ডাকুন। যেমন: আল্লাহ তোমার শরহে সদর করে দিন—বাবা, ওঠো, ওঠো।
- সওয়াবের বাণী শোনান, জাহান্নামের ভয় দেখান, আল্লাহর কথা স্মরণ করান। যেমন বলুন:
  : নামাজ কিন্তু তোমার কবরের আলো হবে।
  : বাবা, ওঠো! জান্নাত বা জাহান্নামের দুটোর একটিই কিন্তু মানুষের শেষ ঠিকানা।
- শরীর থেকে চাদর সরিয়ে দিন, ডাকতে-ডাকতে হালকাভাবে নাড়া দিন।
- আপনার সন্তানের জন্য আজানের টোন সেট করা যায়, এমন একটি অ্যালার্মঘড়ি কিনে আনুন।
- তাদের ঘুম ভাঙাতে গিয়ে "স্কুলে যেতে হবে" না বলে, বরং বলুন, "ওঠো, ফজরের সময় হয়েছে"।
- বাচ্চাকে ঘুম থেকে জাগানোর সময় তার সাথে একটু আমোদ-রসিকতা করুন। কুরআনের আয়াত, হাদিসের বাণী, নাশিদ ইত্যাদি শোনাতে থাকুন। এটি পরীক্ষিত পদ্ধতি। তবে আয়াত-হাদিসগুলো পাঠ করুন আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, হৃদয়ে সেগুলোর মর্ম চিত্রিত করে।
- সন্তানদের জাগিয়ে তোলার পর লক্ষ রাখুন, তারা যেন আবার অন্য জায়গায় গিয়ে শুয়ে না পড়ে।
- যে প্রথমে জেগে উঠবে আর প্রথমে নামাজ আদায় করবে, তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখুন।

- যে তার ভাই-বোনদের প্রতি লক্ষ রাখে আর নামাজের জন্য তাদের ঘুম থেকে জাগায়, তাকে ভালো-ভালো পুরস্কার দিন।
- সমস্ত পদ্ধতি যদি ব্যর্থ পর্যবসিত হয়, তখন দশ বছর বয়সি সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রহারের দ্বারস্থ হোন। আপনি তাদের এ জন্যই প্রহার করবেন যে তাদের দেহ জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে, সে ব্যাপারে আপনি শঙ্কিত, অন্তরে সে-জন্য দরদ আছে। তবে এই প্রহার হতে হবে শিষ্টাচার শেখানোর প্রহার, আজাব বা শাস্তি প্রদানের মতো মারধর নয়।

১৬

আপন সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রেম ও তাঁদের আনুগত্য, আল্লাহর ভয়, তাঁর নিকট আশা রাখা, তাঁর প্রতি পোক্ত ইমান পোষণ ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে তাদের অন্তরে তাওহিদের ভিত্তিগুলো মজবুত করে তুলুন। এ জন্য আপনি তাদের সাথে সৃষ্টজীবকে আল্লাহর প্রতিপালন এবং তাঁর ইবাদত ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে তাঁর একচ্ছত্র অধিকারের ব্যাপারে আলোচনা করুন। মনে রাখবেন, তাওহিদের শিক্ষা হচ্ছে শরীরের জন্য মাথার ন্যায়। আর শরিয়তের ওপর আমল করা বিশুদ্ধ তাওহিদের দীক্ষালাভ ব্যতীত সম্ভব নয়, বিশেষ করে নামাজের আমলে অটল থাকার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভালো রকমের ধৈর্য ও শক্তিশালী ইমান ব্যতীত নামাজের ওপর অবিচল থাকা আসলে সম্ভবপর হয় না।

১৭

জনাব পিতাজি, সন্তানদের অন্তরে আপনাদের প্রতি স্বভাবজাত ভয় কাজ করে, যা সাধারণত মায়েদের প্রতি থাকে না। তাই আপনি বাড়িতে অবস্থানকালে সরাসরি তাদের নামাজের আদেশ করুন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুধু মায়ের কাঁধে ফেলে রাখবেন না!

১৮

ছোটো বাচ্চাদের স্বাভাবিকতই নামাজের সময় হলে তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাই এ ব্যাপারে বিরক্ত হওয়া যাবে না, অলসতা দেখানো চলবে না। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, অনেক সময় ছোটো বাচ্চারা সব সময় নামাজ পড়ে, কিন্তু তাদের ওয়াক্তের কথা খেয়াল থাকে না বা তখন খেলাধুলায় মগ্ন থাকে। আসলে এ সময় শুধু তাদের মনে করিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হচ্ছে, যাদের মনে করিয়ে দিলেই নামাজ পড়তে চলে যায় আর যারা এরপরেও যায় না, তাদের মাঝে বড়ো ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান। আমি মনে

করি, বাচ্চারা ধীরে-ধীরে নামাজে যত্নবান হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেওয়ার বিষয়টি হলো আপনার প্রথম পদক্ষেপ, এমনকি প্রয়োজন হলে এর দ্বারাই কয়েক বছর যাবৎ আপনার সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে প্রচেষ্টা চালানোর পর একসময় দেখবেন, নামাজ পড়ার ব্যাপারে সে এখন নিজেই দায়বদ্ধ হয়ে গেছে, তাকে আর মনে করিয়ে দিতে হয় না।

১৯

প্রিয় অভিভাবক, আপনারা একজন আরেকজনের ওপর সন্তানের নামাজের ভার গছিয়ে দেবেন না। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা দুজনই দায়বদ্ধ, উভয়েরই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। অপরজন দায়িত্ব পালন করল কি, করল না, তা কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাওয়া হবে না। অতএব, আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব তৈরি করুন। কতক পিতা বলে থাকেন, বাচ্চাদের মা তার দায়িত্ব পালন করছে না; আবার মায়েরা বলেন, তাদের বাবা আমাকে সহযোগিতা করেন না; আর এ বলে নিজের কর্তব্যে অবহেলা করতে থাকেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর সামনে কিন্তু এগুলো উজর-আপত্তি হিসেবে মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০

বাচ্চাদের নামাজের অভ্যাস করানো আর নেক কাজের আদেশের জন্য আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখুন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে নেক কাজের দিক-নির্দেশনা দেয়, তার জন্যও কর্তার ন্যায় প্রতিদান রয়েছে।"[৪৭] তাহলে ভেবে দেখুন, আপনার ছেলে সারাজীবনে কত হাজারবার নামাজ আদায় করবে! আবার আপনার যদি একাধিক সন্তান থাকে, তাহলে প্রত্যেকদিন পাঁচবার করে কত নেকি আপনার আমলনামায় জমা হচ্ছে! নফল নামাজের হিসেব নাহয় বাদই থাকল!

২১

নামাজে অভ্যাস করানোর শুরুর দিকে উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেক নামাজের পরপরই কিছু পুরস্কার দেওয়া। সেটা হতে পারে চকলেটজাতীয় কিছু একটা। তারপর এটা দৈনিকে নিয়ে আসুন। এরপর সে যখন কিছুটা স্বভাবজাত যত্নবান হয়ে পড়বে, তখন আপনার বুঝ অনুযায়ী তা সপ্তাহ-মাসভিত্তিক পিছিয়ে নিতে থাকুন। তবে পুরস্কারগুলো যেন ভারসাম্যের মধ্যে থাকে। আর তার মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করতে থাকুন, নামাজ মূলত আল্লাহর প্রতি তার নিজেরই কর্তব্য।

---

৪৭. *সহিহ মুসলিম*: ১৮৯৩—দারে তাইয়িবা—।

২২

আপনার নামাজি সন্তান আর নামাজে অযত্নবান সন্তানের প্রতি ভালোবাসা-অনীহায় পার্থক্য ফুটিয়ে তুলুন। যে নামাজি, সে যেন আপনার বেশি প্রিয় ও নৈকট্যভাজন হয়। আর যার তাতে শিথিলতা রয়েছে, তার আদর-সোহাগের মাত্রাও ততটুকু পরিমাণ কমিয়ে আনুন। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক পিতা-মাতা এ ব্যাপারটি পরীক্ষায় ভালো-খারাপ ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে থাকেন, অথচ এ ক্ষেত্রে নামাজই ছিল প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত!

২৩

আপনি আর আপনার সন্তান যখন পরস্পর দূরে থাকেন, তখন নামাজের সময় হলে তা আদায় করে নেওয়ার জন্য তার ফোনে সুন্দর ও মর্মস্পর্শী বাক্যে একটি ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিন।

২৪

সন্তানদের বোঝান, নামাজের দায়িত্ব যুদ্ধ-ভীতি-অসুস্থতা কোনো অবস্থাতেই মাফ হয় না। তাদের 'সলাতুল খাওফ'[৪৮] (শঙ্কাপূর্ণ নামাজ) পড়ার বিবরণ শোনান, তারপর বলুন—নামাজ যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ না-ই হতো, তবে অবশ্যই ভীতি আর অসুস্থতার সময় তা মাফ হয়ে যেত। তাহলে ভেবে দেখ, নিরাপদ, সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য তা কত গুরুত্বপূর্ণ!!

২৫

কখনো তাদের বঞ্চিত করার পদ্ধতি অবলম্বন করুন। এটি দু-ভাবে হতে পারে। এক: মানসিকভাবে। যেমন, চুমু না খাওয়া, তাকে গুরুত্ব না দেওয়া। দুই: বৈষয়িকভাবে। যেমন, তাকে কোনো উপহার না দেওয়া, কোথাও বেড়াতে না নিয়ে যাওয়া।

২৬

সন্তানের নিকটাত্মীয় আর তার সমবয়সিদের সামনে ভারসাম্যতা বজায় রেখে তার প্রশংসা করুন। এতে সে নামাজ ও অন্যান্য আমলের প্রতি উৎসাহ পাবে।

---

৪৮. অর্থাৎ, মানুষ, প্রাণিকুল ইত্যাদির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিপদাশঙ্কা থাকলে বিশেষ পদ্ধতিতে নামাজ আদায়। বিস্তারিত জানতে সুরা নিসার ১০২ নম্বর আয়াত ও তার তাফসির দেখুন। (অনুবাদক)

২৭

বাবা-মায়েরা সন্তানদের সাথে যত নরমই হোক না কেন, নামাজের কথা বলার সময় তাদের মধ্যে একপ্রকার গম্ভীর ভাব নিয়ে আসা উচিত। বাচ্চাদের মধ্যে যদি এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখা যায়, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাদের চেহারার ভাঁজগুলো যেন কুঁচকে ওঠে!

২৮

বাচ্চাদের জন্য অজু-নামাজ নিয়ে তৈরি আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় কিছু ভিডিও এনে দিন।

২৯

মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে নিজ সন্তানদেরকে প্রতিবেশী বাচ্চাদের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করে দিন। এ জন্য ভালো পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রাখুন।

৩০

সর্বদা সময়মতো নামাজ পড়ার অঙ্গীকার নিয়ে সন্তানদের যুক্তিসম্মত আবদারগুলো পূরণ করুন।

৩১

তারা চেনে, এমনকিছু বেনামাজি মানুষের গল্প শুনিয়ে তাদের জীবনাচার, বদচরিত্র, ব্যর্থতা, চেহারার মলিনতা ইত্যাদির কথা বোঝান।[৪৯]

৩২

বাচ্চাদের শুধু মসজিদে যাওয়ার প্রতি নয়, বরং আগে-আগে সেখানে গমনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন।

৩৩

সন্তানকে নিয়ে একাকী বসে নামাজের উপদেশ, উৎসাহ দিন। এতে খুব ভালো ফল আশা করা যায়।

---

৪৯. এ ক্ষেত্রে সম্ভবত সরাসরি পরিচিত কারো উদাহরণ না টেনে কাল্পনিক চিত্র উল্লেখ ভালো হবে। শিশুদের কোমল মনে সমালোচনার চিত্র প্রতিফলিত না হওয়াই মনে হয় তাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (অনুবাদক)

৩৪

সন্তানের দশ বছর হওয়ার পর প্রয়োজন হলে প্রহারের দ্বারস্থ হোন। তবে আদব শেখানোর প্রহার করবেন, শাস্তি দেওয়ার মতো প্রচণ্ড মারধর নয়। এ ক্ষেত্রে শরয়ি সীমারেখা মেনে চলুন। আপনি এমন অভিভাবক হতে যাবেন না, যারা স্বীয় স্বার্থে ব্যঘাত ঘটলে তো ঠিকই প্রহার করে করে, অথচ নামাজের জন্য কিছুই বলে না! অর্থাৎ, তারা নিজেদের জন্য ঠিকই রেগে ওঠে, কিন্তু আল্লাহর খাতিরে তাদের মধ্যে কোনোরূপ ক্রোধ জাগে না!

৩৫

আপনার সন্তানকে মসজিদভিত্তিক কুরআন হেফজের দরসে বসিয়ে দিন, নেককার ছেলেদের সাথে মিশতে দিন। এতে সে কার্যতভাবেই ওয়াক্তমতো নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত হবে, সৎ মানুষদের সংস্পর্শে থেকে উত্তম গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হবে।

৩৬

প্রিয় অভিভাবক, আপন সন্তানের জন্য আপনাদেরই উত্তম আদর্শ হতে হবে। তাদের সামনে আপনাদেরই নামাজের প্রতি অধিক গুরুত্বপ্রদানকারী হতে হবে। সর্বপ্রথম ওয়াক্তমতো নামাজ আদায় করে দেখাতে হবে।

৩৭

বাচ্চাকাচ্চাদের একে অপরকে নামাজের উপদেশ প্রদান ও পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অভ্যাস করান। তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগ্রত করুন, সে যেন শুধু নিজের কল্যাণেই সন্তুষ্ট না থাকে, বরং বিশেষত তার ভাই-বোনসহ সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ নিয়েই চিন্তা করে।

৩৮

নামাজ ত্যাগকারীর শাস্তি সম্পর্কে কিছু কথা আকর্ষণীয় ও বড়ো-বড়ো স্পষ্ট অক্ষরে লিখে ঘরের খোলামেলা কোনো স্থানে টাঙিয়ে রাখুন।

৩৯

সন্তানদের নামাজের ব্যাপারে অনবরত চাপ দিতে থাকুন। বাক্যটির প্রতি লক্ষ করুন, "অনবরত চাপ দেওয়া"—গুরুত্বহীনভাবে স্বাভাবিক আদেশের কথা বলা হচ্ছে না। তবে আপনার নির্দেশের পদ্ধতিটি যেন গ্রহণযোগ্য ও সুন্দর হয়; অবিরত আদেশের ফলে তার মধ্যে যেন আবার নামাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি না হয়ে যায়, সেই খেয়ালও রাখা চাই!

৪০

ইতিবাচক কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অনুপ্রেরণা দিন। যেমন বলতে পারেন—আমি নিশ্চিত, তুমি আজ খুব খুশি, তুমি তো আজকের সবগুলো নামাজ ওয়াক্তমতো পড়েছ!

৪১

নামাজি সন্তানদের বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখুন। যেমন, তাদের সাথে পরামর্শ করা, কোথাও গেলে তাদের সঙ্গে নেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা, নামাজে অবহেলাকারীদের তুলনায় নামাজিদের কিছুটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রাখুন।

৪২

দিনে কয়েকবার তাদের নামাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন। এ ক্ষেত্রে বিরক্ত হবেন না, কারণ এতে আপনার আমলনামায় নেকি লেখা হচ্ছে। আপনি তাদের আদরের সাথে নরম সুরে বলুন—আব্বু নামাজ পড়েছ? মেয়েকে বলুন—আমার বাগানের গোলাপটি, নামাজ পড়েছ তুমি?

৪৩

নিজের বিয়ে ও সন্তান আগমনের পূর্বেই তাদের কীভাবে নামাজি বানিয়ে তুলবেন, সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করুন। জি, তখন থেকেই ভাবতে থাকুন। আরো চিন্তাফিকির করুন সৎ স্ত্রী/স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে। আল্লাহর রহমতে, বরকতময় এমন বিয়ের মাধ্যমেই আপনাদের ঘরজুড়ে আসতে পারে কল্যাণময় একবংশধারা।

৪৪

পরিবারের লোকেরা একত্রিত হলে ছোটো-বড়ো সকলে মিলে জামাতে নামাজ আদায় করুন।

৪৫

সন্তানদের জাহান্নাম ও তার আজাবের ব্যাপারে সতর্ক করা এবং জান্নাতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের সময় নিজের চোখে পানি নিয়ে আসুন। এতে তারা আপনার কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে। ফলে তাদের অন্তরে গভীর রেখাপাত হবে।

৪৬

প্রিয় পিতৃসমাজ, সন্তানদের মা যখন তাদের নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তখন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সহযোগিতা করা। বিশেষ করে নারীরা যখন পিরিয়ড ও সন্তান প্রসবকালীন নামাজ থেকে দূরে থাকেন, কিছু নারী তখন সন্তানদের নামাজের কথা বলতে ভুলে যায়। অতএব, পিতাদের ওপরও কিন্তু এ ব্যাপারে বড়ো দায় রয়েছে, কারণ আল্লাহ তাদেরও বাচ্চাদের নামাজের আদেশের ব্যাপারে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

কিন্তু পিতা যদি বাড়ি থেকে দূরে কোথাও অবস্থান করেন, তবে প্রিয় বোন আমার, তখন কিন্তু সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত অবহেলা, অলসতা ত্যাগপূর্বক আপনারই এই দায়িত্ব সামলে নিতে হবে।

৪৭

বাচ্চাদের নিকট নামাজিদের সওয়াব আর বেনামাজিদের শাস্তি নিয়ে আলোচিত কুরআনের আয়াতগুলো পাঠ ও বিশ্লেষণ করে শোনান, এ সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করুন। দায়িত্ব পালনের জেরে এটি আপনার অবশ্যকর্তব্য। সংক্ষিপ্ত কোনো তাফসিরগ্রন্থেরও শরণাপন্ন হোন, এতে আপনার দায়িত্ব আদায় সহজ হবে।

৪৮

সন্তানরা নামাজ পড়ার পর ভারসাম্যের সাথে তাদের প্রশংসা করা দাওয়াতমূলক পরিচর্যা। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নেক কাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়ার মানসে সাহাবিদের প্রশংসা করতেন। যেমন, তিনি আব্দুল কায়স গোত্রের আশাজ্জ নামক ব্যক্তির উদ্দেশে বলেন, "তোমার মধ্যে বিচক্ষণতা ও ধীরস্থিরতা নামক দুটি গুণ রয়েছে, আল্লাহ এগুলো পছন্দ করেন।"[৫০]

৪৯

প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে বাচ্চাদের কাছে দুনিয়া আর আখেরাতের নেয়ামতের পার্থক্য তুলে ধরুন। এতে তাদের অন্তর চিরস্থায়ী নেয়ামতের প্রতি ঝুঁকবে আর তা অর্জনের জন্যই তারা আমলে ব্রতী হবে।

৫০

---

৫০. *সহিহ মুসলিম*: ১৮—দারে তাইয়িবা—।

আপনি যখন নামাজ আদায় করতে দাঁড়ান, তখন সন্তানদেরও নামাজ আদায় করে নিতে বলুন। এতে সকলকেই একসাথে নামাজ পড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

৫১

বাচ্চাদের শুধু 'নামাজ পড়ো'—এটুকু বাক্য বলা যথেষ্ট নয়। দেখা যায়, কতক পিতা-মাতা বছরের পর বছর বাচ্চাদের এই শব্দ শুনিয়ে যান, অথচ বাচ্চারা এর অর্থের কিছুই আঁচ করতে পারে না। যে-কারণে তারা একদম বিরক্ত হয়ে পড়ে। বাচ্চারা মনে-মনে ভাবে, তারা আমাকে নামাজ পড়তে কেন বলে?! নামাজ পড়তে তো কষ্ট লাগে!

তদ্রূপ, শুধু এটুকু শোনানোও যথেষ্ট নয়—"যারা নামাজ পড়বে, তারা জান্নাতে যাবে; আর যারা পড়বে না, তারা জাহান্নামে যাবে।" বরং তাদের বুঝিয়ে বলুন জান্নাত আর জাহান্নাম কী জিনিস। তাদের নিকট এ দুটোর সৌন্দর্য ও ভয়াবহতার পরিচয় তুলে ধরুন। তাদের মধ্যে এমন চেতনা সৃষ্টি করুন, যেন তারা জান্নাতে যেতে ভালোবাসে, আগ্রহ পোষণ করে আর জাহান্নামকে অপছন্দ করে, তা থেকে দূরে থাকার কামনা করে। তাদের বোঝার জন্য আপনি তাদের বয়স অনুপাতে আলোচনার ভঙ্গি অবলম্বন করে ওগুলোর কথা খুলে বলুন, তাদের মধ্যে সত্তাগত উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করুন।

৫২

আপনার সন্তানকে আবেগ, অনুরাগমিশ্রিত কণ্ঠে বলুন—

: আব্বু/আম্মু, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তাই আমি তোমার ব্যাপারে জাহান্নামের শাস্তি নিয়ে চিন্তিত। তুমি আমার মতো আন্তরিক উপদেশদাতা কোথাও পাবে না, কারণ তুমি যে আমার কলিজার টুকরা! তাই তুমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, এটা আমি কখনোই বরদাশত করতে পারব না। আমি চাই, তুমি যেন আমার সাথে জান্নাতে থাকো, আমি তোমাকে কখনোই জাহান্নামের লাকড়ি হতে দিতে পারি না!

৫৩

আপনার সন্তান যখন সাত বছরের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তখন তার যে নামাজ পড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে, সে কথা স্মরণ করাতে থাকুন। এতে সে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে, ফলে পরবর্তী সময়ে আপনার দায়িত্ব আদায় বেশ সহজসাধ্য হবে।

৫৪

আপনার সন্তানরা যখন আপনাকে কেয়ামতের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করে, তখন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের বলুন—দুনিয়াতে যত্নের সাথে নামাজ আদায়ই সেদিনের সফলতা ও মুক্তির উপায়।

৫৫

আল্লাহর প্রতি উৎসাহ ও ভীতি প্রদানের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখুন, একচেটিয়াভাবে কোনোটি ব্যবহার করবেন না।

৫৬

আমাদের অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে, আমরা নিজেরা আর আমাদের সন্তানদের জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের রঙে রঙিন করব, সকলেই আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে উঠব। সে-জন্য আমাদের বাচ্চাদের অন্তরে ছোটোকাল থেকেই ইবাদত করার সুপ্রভাব এবং তা ত্যাগের কুপ্রভাবের ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মাতে হবে।
যেমন আপনি তাদের বোঝাবেন—যারা নামাজ ত্যাগ করে, তারা আল্লাহর শাস্তির কবলে পড়বে। এ ছাড়া, পাপ করলে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও মানুষের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। পক্ষান্তরে, জীবনের তৃপ্তি, সহজসরল জীবনযাপন, সফলতা ইত্যাদি লাভ হয়ে থাকে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে, বিশেষ করে নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার ফলে।

৫৭

সন্তানদের সব সময় স্ববিস্তারে বোঝান, তাদের ওপর আল্লাহর কত ধরনের নেয়ামত রয়েছে। আমাদের চারপাশ ঘিরে থাকা ছোটো-ছোটো যে-সকল নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত উদাসীন হয়ে থাকে, সেগুলোর দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করুন। তারপর বলুন, আমরা এ সমস্ত নেয়ামত ভোগ করার কারণে নেয়ামতদাতার প্রতি ইবাদত করে ও তাঁর জন্য নামাজ আদায়ের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা আমাদের ওপর একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন, যেন তারা সেই নেয়ামতদাতাকে ভালোবেসে ফেলে। তাদের নিকট বাস্তব ঘটনা থেকে এমনকিছু উদাহরণ তুলে ধরুন, যেগুলো আল্লাহর বড়োত্ব ও তাঁর ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ততা প্রমাণ করে। উদাহরণগুলো হতে পারে সন্তানদেরই জীবনের কোনো ঘটনা অথবা জগৎ থেকে বেছে নেওয়া প্রকৃষ্ট কোনো উদাহরণ। যেমন বলতে পারেন—
: বলো তো দেখি, তোমার জন্য আব্বু-আম্মু কে দিয়েছেন আর অমুক এতিম হলো কীভাবে?

: বলো তো, তোমার পা কে দিয়েছেন আর অমুক কেন হাঁটতে পারে না?!
: তুমি কি বলতে পার, আমাদের দেশে কে নিরাপত্তার ছায়া দান করেছেন আর অমুখ দেশে কীভাবে যুদ্ধবিগ্রহ আর শঙ্কার জীবন চলছে বছরের পর বছর ধরে?!

৫৮

আপনার সন্তানকে এভাবে বলুন—নামাজই হচ্ছে বেদ্বীনদের সাথে তোমার পার্থক্যরেখা। এবার তুমিই ভেবে বলো, তুমি কোন দলে থাকতে চাও?[৫১]

৫৯

স্বপ্রণোদিত হয়ে নামাজ পড়ে নিলে সন্তানদের প্রশংসা করুন।

৬০

নামাজের জন্য সন্তানদের অজুর তাগিদ দিন আর নিজে এর তদারকি করুন। তাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই হাদিসটি শোনান, "যার অজু নেই, তার কোনো নামাজ নেই।"[৫২]

৬১

আপনার সন্তানের প্রিয় বস্তুগুলোর কথা উল্লেখ করে তাকে বলুন, জান্নাতে এসব রয়েছে অসংখ্য পরিমাণে। আরো বলুন, সেখানে এগুলোর স্বাদ ও তৃপ্তিদানকারী ক্ষমতা একদম পরিপূর্ণ, দুনিয়ারগুলোর থেকে তথাকার নেয়ামত কোটিগুণ উত্তম!

৬২

মায়েরা আপন মেয়েদের বলুন—গুনাহ করলে চেহারা কালো হয়ে যায়, যদিও তুমি এমনিতেই সুন্দর হও বা প্রসাধনীও ব্যবহার করো না কেন। অন্যদিকে, তুমি নেক আমল করলে তোমার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তুমি শ্যামবর্ণের হলেও সমস্যা নেই। আসলে, এই উজ্জ্বলতা-মলিনতার সঙ্গে ত্বকের সৌন্দর্য-কুৎসিত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই, তাই মানুষ এগুলো গোপন করতে পারে না। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের চোখে ঠিকই এগুলো ধরা পড়ে যায়।

---

৫১. ঈষৎ পরিমার্জিত। (অনুবাদক)

৫২. *মুসতাদরাকে হাকেম:* ৫১৮।

৬৩

নামাজের বিষয়টিতে বাচ্চাদের পড়াশোনার চেয়েও বেশি খেয়াল রাখুন।

৬৪

তাদের এমন সব ঘটনা শোনান, যেখানে গুরুত্বসহ নামাজ আদায়ের কারণে মানুষের শুভ পরিণতি এবং তা ত্যাগের দরুন তাদের মন্দ পরিণতির কথাবার্তা থাকবে। এ ক্ষেত্রে কিছু ঘটনা চয়ন করুন সালাফে সালিহিনের জীবনী থেকে আর কিছু ঘটনা শোনাবেন সমসাময়িক গল্প থেকে।

৬৫

সময়ে-সময়ে বাচ্চাদের নামাজের আদেশ সম্পৃক্ত আয়াতগুলো পড়ে শোনান। যথা,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।" (সুরা বাকারা: ৪৩)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"তোমরা সমস্ত নামাজ, বিশেষ করে 'মধ্যবর্তী নামাজ'[৫৩]-এর ক্ষেত্রে যত্নবান হও এবং আল্লাহর সামনে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও।" (সুরা বাকারা: ২৩৮)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"যে পরিশুদ্ধ হয়েছে আর তার প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামাজ আদায় করেছে, সে সফল হয়ে গেছে।" (সুরা আলা: ১৪-১৫)

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

৫৩. অর্থাৎ আসরের নামাজ। এর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষ সাধারণত এ সময় কাজকর্ম গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যে-কারণে নামাজ আদায়ে উদাসীনতা প্রদর্শিত হয়। সূত্র: *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকা। (অনুবাদক)

“হে আমার ছেলে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, সৎকাজের আদেশ করো, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটি হচ্ছে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ।” (সুরা লুকমান: ১৭)

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো।” (সুরা আহযাব: ৩৩)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

“আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে আজীবন নামাজ আর জাকাত আদায়ের অসিয়ত করেছেন।” (সুরা মারয়াম: ৩১)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

“সে-সমস্ত নামাজির জন্য দুর্ভোগ, যারা আপন নামাজের ক্ষেত্রে উদাসীন।”(সুরা মাউন: ৪-৫)

৬৬

প্রিয় মা, আপনি যদি মেয়েকে নিয়ে কোথাও যেতে চান, কিন্তু তৈরি হতে গিয়ে সে ইতোমধ্যেই দেরি করে ফেলেছে, তবুও তাকে এভাবে বলবেন না—তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে নাও, আমাদের দেরি হয়ে গেছে! বরং বলুন—তাড়াতাড়ি কাপড় পড়, এরপর ধীরেসুস্থে নামাজ পড়ে নাও।

তদ্রূপ, সন্তানের নামাজের কারণে আপনার দেরি হয়ে গেলে তাদের কোনোরূপ ধমক দেবেন না, বরং শুরুর ওয়াক্তে তাদের নামাজ পড়ে নেওয়াটাই যেন আপনার একান্ত কামনা হয়।

৬৭

সন্তানদের সাথে বেশি-বেশি করে আল্লাহর নিকট নামাজের গুরুত্ব, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, ইমানের ছয়টি স্তম্ভ ইত্যাদি নিয়ে কথা বলুন।

৬৮

দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ অন্তরসমূহ সজীব করে তোলেন। অতএব, আপনি তাঁর কাছে আপন সন্তানের জন্য শুধু দোয়া করুন, বদদোয়া করতে যাবেন না কখনো। তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করুন, আবার কখনো তার সামনেও দোয়ায় হাত তুলুন।

৬৯

'আল্লাহর জন্য অপরকে ভালোবাসা' সংক্রান্ত নীতিটির ওপর আমলকরত স্বীয় অন্তরে সন্তানদের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার বীজ রোপণ করুন। যেই ভালোবাসার ফলে আপনি তাদের জান্নাতের পথে ডাকবেন আর একদম হাত ধরে সেদিকে নিয়ে যাবেন। আবার জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচাবেন আর স্বয়ং নিজে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে তাদেরকে তার আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

৭০

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। তিনি আপনার কষ্ট-সাধনাকে কাজে পৌঁছাবেন, আপনার সন্তানদের সৎ মানুষ হওয়ার তওফিক দেবেন, সে ব্যাপারে তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করুন।

৭১

মাত্র পাঁচটি বছর কষ্ট করুন, এরপর সারাজীবন তৃপ্তির সাথে কাটিয়ে দিন। সন্তানদের ছোটো বয়সেই নামাজ ও অন্যান্য সৎ আমলে অভ্যস্ত করে তোলার সুখময় ফল সারাজীবন ধরে উপভোগ করুন। বিশেষত প্রথম সন্তানের সৎ চালচলনের তৃপ্তি।

৭২

নামাজে পড়ার জন্য বাচ্চাদের ছোটো-ছোটো সুরাগুলো শেখান, তারপর সেগুলোর তাফসির ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও শোনান। এতে তারা সেগুলো মুখস্থ করার পাশাপাশি মর্মও বুঝে নিতে পারবে।

৭৩

মেয়ে বাচ্চাদের নামাজে উৎসাহিত করার জন্য ওড়না ও জায়নামাজ কিনে দিন।

৭৪

কল্পনা করুন, আপনার সন্তানরা জাহান্নামে চলে যাচ্ছে আর অমুকের সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করেছে! সত্য বলতে, আপনার অন্তরে যদি নিজের সন্তানদের প্রতি দয়ামায়া ও ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে, তবে আপনি কখনোই এটি হতে দেবেন না!

পক্ষান্তরে, প্রকৃত ভালোবাসা যাদের অন্তরে কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা পড়ে আছে, তারাই আপন সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নামে ঠান্ডা, গরম, ঘুমের আরাম নষ্ট হওয়া বা পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে নামাজ থেকে দূরে রাখতে পারেন! অথচ এই মিথ্যে ভালোবাসা দেখানোর মাধ্যমে আপনি তাদের আরো বড়ো শাস্তির সম্মুখীন করে তুলছেন! তাদের প্রতি যদি আপনার অন্তরে সত্যিকার ভালোবাসাই বিদ্যমান থাকে, তবে অবশ্যই তাদের জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মতো ভালোবাসাই আপনার থেকে প্রকাশিত হবে। কিন্তু কোথায় সেই ভালোবাসা আপনার?!

৭৫

আপনার বাচ্চাদের যখন কোনো পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন, তখন তার মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি খেয়াল রাখুন। কারণ, আপনার এক সন্তানের জন্য যেটা উপযোগী, অন্যের জন্য তা উপযোগী নাও হতে পারে।

৭৬

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে যথাসময়ে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সন্তানদের সহযোগিতা করুন:

- জোহর বা আসরের নামাজের সময় দিনের খাবার দেবেন না।
- এশার নামাজের সময়ও খাওয়াতে বসাবেন না; একটু আগে বা পরে দিন।
- মসজিদের আশপাশে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করুন।
- শীতের সময় তাদের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা রাখুন।
- তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমোতে দিন। এমন যেন না হয়—নামাজের একটু আগে ঘুমোতে দিলেন, ফলে নামাজের সময় আর ওঠা সম্ভব হয় না। যেমন, সকালে উঠে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য কতক মা তাদের বুঝমান সন্তানদের এশার আগে ঘুম পাড়িয়ে দেন; আর কতক বাচ্চা আসরের একটু আগে দুপুরের খাবার খায়, এরপর ঘুমিয়ে যায়—যে-কারণে তাদের নামাজ পড়া হয় না। অতএব, আপনার সন্তানরা যেন নামাজ আদায় ব্যতীত ঘুমোতে না যায়, বিশেষ করে নামাজের সময় ঘনিয়ে আসার পর না ঘুমানোর প্রতি লক্ষ রাখুন।

৭৭

সন্তানের মনে নামাজের ব্যাপারে দায়িত্ববোধ আর জবাবদিহির চেতনা জাগ্রত করুন। যেমন, তাদের বারবার এরকম বলুন—আমি কিন্তু ঠিকই তোমাকে নামাজ পড়তে বলেছি, এবার তোমার নিজের আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তার হিসাব দিতে হবে। আমার ভয় হয়, তুমি না আবার জাহান্নামে চলে যাও! আমি খুব করে চাই, তুমি জান্নাতবাসী হও। এবার তুমিই বলো, তুমি কোন পথে যাবে?!

৭৮

আপনি ওয়াজ মাহফিল, ইসলামি বই বা অডিও-ভিডিও-এর মাধ্যমে নামাজ ও কেয়ামতের ব্যাপারে যা-যা জেনেছেন, সেগুলো তাদেরও শোনান। যেমন:

: হুজুর আজ ওয়াজে বলেছেন, কবরে নাকি এভাবে-এভাবে আজাব দেওয়া হবে!

: আজ এই বইটি পড়তে গিয়ে পেলাম, নামাজ পড়লে এই-এই লাভ হয়।

: জানো, মোবাইলের বয়ানে আজ এক বেনামাজি ব্যক্তির চরম দুর্দশার কথা শুনলাম!

৭৯

প্রায়োগিক শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব দিন। যেমন, আপনার নিজের আর আশপাশের আত্মীয়স্বজনের সন্তানদের একত্রিত করুন। এরপর একদিন তাদের অজু করিয়ে শেখান, একদিন নামাজ পড়িয়ে শেখান, একদিন তাদের সকলকে নিয়ে জামাতে নামাজ পড়ুন।

এ ছাড়া, শুদ্ধভাবে নামাজ আদায় এবং অজু-সালাতের সহজ-সহজ মাসয়ালাগুলো দ্বারা মৌখিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন, প্রায়োগিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে বিষয়বস্তু দ্রুত আত্মস্থ হয়ে যায়, এ ছাড়া তাতে বিস্মৃতিও আসে না।

৮০

সন্তানদের ইবাদতের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তুলুন। প্রতিটি নেক আমলের ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরি করুন, বিশেষ করে নামাজের ক্ষেত্রে।

৮১

সন্তানদের জন্য এমন বইপত্র, অডিও-ভিডিও এনে দিন, যেখানে আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে আলোচনা থাকবে, নামাজ ত্যাগকারীর দুর্গতির কথা থাকবে, কবর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির কথাও আলোচিত হবে।

এ ছাড়া এমন কিছু বইপুস্তিকা আছে, যেগুলোতে মৃত ব্যক্তির গোসল ও কাফনের পদ্ধতি, কবর ইত্যাদির ছবি থাকে। বস্তুত, এগুলো তাদের অন্তরে নাড়া দেবে এবং তাদের নামাজের প্রতি ধাবিত করবে।

৮২

কখনোই সন্তানের নামাজের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করবেন না। হোক সে অসুস্থ, বাড়ির বাইরে, ভ্রমণে, কারো সাক্ষাতে, পরীক্ষার দিনগুলোতে, ছুটির দিনে, অঘুমো রাত-জাগরণ, নিকটাত্মীয়ের বাহুডোরে ঘুমন্ত।

৮৩

নামাজের সময় হওয়ার বিশ মিনিট আগেই আপন সন্তানকে নামাজের জন্য তৈরি হতে তাগিদ দিন। এতে সে তাকবিরে তাহরিমার সাথে নামাজ পড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। এরপর থেকে মাসবুক হওয়াটাই তার কাছে বিরাট বিষয় বলে গণ্য হবে!

৮৪

আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনার পাশাপাশি ঘরের বড়োদের থেকেও সহযোগিতা গ্রহণ করুন। যেমন দাদা-দাদি, চাচা, ফুফু, গৃহকর্মী। কেননা, আপনার সন্তানের নামাজের আদেশের ক্ষেত্রে তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

৮৫

প্রিয় মা, মনে করুন আপনি আপনার সাবালিকা মেয়েকে নিয়ে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, এতক্ষণ সময় নিয়ে সে সাজগোজ করেছে, অথচ তার এশার নামাজই হয়নি, আবার তার এখন তার অজুও নেই! আবার এমনিতেই আপনাদের দেরি হয়ে গেছে! তো এ ক্ষেত্রে আপনি কী করবেন?

শুনুন, এ মুহূর্তে আপনি পুরোপুরি দিলখোলাভাবে কোনোরূপ বকাঝকা ব্যতীত তাকে বলুন, "যাও, মুখ ধুয়ে অজু করে এসো আর নামাজ পড়ে নাও।" এর জন্য নাহয় একটু দেরিই হলো।

কোনোমতেই তাকে বলতে যাবেন না—"ফিরে এসে নামাজ পড়ে নিয়ো।" অর্থাৎ বাড়ি ফিরতে-ফিরতে যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি এমনটি করেন, তবে আপনি আল্লাহর এই ধমকির প্রয়োগক্ষেত্র হবেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"দুর্ভোগ সে-সমস্ত নামাজির, যারা আপন নামাজের ব্যাপারে উদাসীন।" (সুরা মাউন: ৪-৫)

এ ছাড়া আপনি নিজেও তটস্থ হোন, কারণ আপনি তাকে পাপের নির্দেশ দিচ্ছেন! একটি অনুষ্ঠানের কারণে নিজে আর কলিজার টুকরো সন্তানকে জাহান্নামের কয়লা বানাবেন না দয়া করে!!

৮৬

আপনার বড়ো সন্তানকে বলুন, সে যেন তার ছোটো ভাই-বোনদের নামাজের প্রতি উৎসাহিত করে। ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ওপর বড়ো ভাই-বোনের প্রভাব আপনার চেয়েও বেশি হতে পারে।

৮৭

বাসায় মেহমানদের সাথে কোনো বাচ্চা এলে তার নামাজের খোঁজখবর রাখুন। কারণ, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা নিজের জন্য ভালোবাসার জিনিস যতক্ষণ অপর ভাইয়ের জন্যও ভালো না বাসবে, ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না।"[৫৪] আর আপনি নিশ্চয় আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে আপনার সন্তান যেন নামাজি হয়! অতএব, আপনার অন্যান্য মুমিন ভাই-বোনের সন্তানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কামনা রাখুন।

৮৮

আপনার বাচ্চা যেন বড়োদের নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, সদকা, উমরা অর্থাৎ তাদের ইবাদতগুলোর অনুসরণ করে, সে ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দিন। এতে সেও এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

৮৯

আপন সন্তানকে শেখান, বড়োদের যেমন ছোটোদের নামাজের ব্যাপারে আদেশ করতে হবে, তদ্রূপ বড়োরা যদি নামাজ পড়তে শিথিলতা দেখায়, তখন তোমাদেরও দায়িত্ব হচ্ছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া। তাদের নামাজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'-এর অন্তর্ভুক্ত, এটি খুব বড়ো ইবাদত আর এ জন্য তোমাদের সওয়াব দেওয়া হবে।

৯০

এমন অনেক মা-ই আছেন, যারা তাদের সন্তানকে নামাজের অভ্যাস করানোর ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকেন। বাচ্চার বাবা তাদের পাশে উপস্থিত থাক বা না থাক, সেটাকে অজুহাত বানিয়ে তারা আপন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন না। তাদের এই বোধ রয়েছে যে—আপন সন্তানের নামাজের ব্যাপারে সর্বাবস্থায়ই তাদের জবাবদিহি করতে হবে! বাচ্চাদের মায়ের অনুপস্থিতিকালে পিতাদেরও একই কর্তব্য।

৯১

সন্তানদের জন্য সৎসঙ্গ খুঁজে বের করুন, তাদের সৎ মানুষদের সংসর্গে রাখুন। আপনি যখন জানতে পারেন যে অমুকের আপনার মেয়ের সমবয়সি কন্যা আছে আর তারা ভালোভাবে শরিয়ত পালন করে, তখন আপনার মেয়েদের অধিকহারে

---

৫৪. *সহিহ বুখারি:* ১৩।

তাদের সংস্পর্শে রাখুন। তাদেরও আপনার মেয়ের সাথে সব সময় মিশতে বলুন। অনুরূপ দায়িত্ব পিতারও, তারও ছেলে সন্তানদের ক্ষেত্রে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

৯২

দ্বিধা পরিত্যাগ করে দৃঢ়, অবিচল হোন! আপনার এই সুদৃঢ় ইচ্ছার পেছনে যত্নশীলরূপে প্রচেষ্টা ব্যয় করুন। ইনশাআল্লাহ, সফলতা অবশেষে আপনার পদচুম্বন করবে। ভুলে যাবেন না, কষ্ট-ক্লান্তির নিরিখে আপনি একপ্রকার জিহাদে রয়েছেন। এ জন্য আল্লাহর নিকট আপনার প্রতিদানও রয়েছে। সুতরাং, শিথিলতা ত্যাগ করুন, নিরাশা ঝেড়ে ফেলুন। মনে রাখুন, প্রতিটি পিতা-মাতাই কিন্তু তার সন্তানের পেছনে চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করে থাকেন। আর আমাদের ভরসাস্থল আল্লাহ নিশ্চয় আপনার সঙ্গে রয়েছেন।

হোঁচটের চোটে হতোদ্যমতা নয়;
উঠুন, ছুটে যান শিখর পানে।

গ্রন্থসূত্র

১। আল-কুরআন।

২। ফজলে এলাহি রচিত *আল-ইহতিসাব আলাল আতফাল* (মুআসসাসাতুল জারিসি, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯হি.)।

৩। আবদুল মালেক কাসেম রচিত *আবনাউনা ওয়াস-সলাত* (দারুল কাসেম, রিয়াদ)।

৪। ড. কাফফাহ ফাইয়াজ রচিত *আফকারু মান যাহাব* (Brain power, সংযুক্ত আরব-আমিরাত; প্রথম সংস্করণ, ২০০১খ্রি.)

৫। *তাফসিরে ইবনে কাসির* (দারুল কলম; দ্বিতীয় সংস্করণ)।

৬। আবদুর রহমান সাদি রচিত *তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান* (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৭হি.)।

৭। মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমিন রচিত *হুকমু তারিকিস সলাতি ওয়া ফিতানুল মাজাল্লাত* (মাকতাবাতুদ দিয়া)।

৮। আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ দুসরি রচিত *সফওয়াতুল আসারি ওয়াল মাফাহিম মিন তাফসিরিল কুরআনিল আজিম।*

৯। আবদুল্লাহ বিন সাদ ফালেহ রচিত *আস-সলাত: আহাম্মিয়্যাতুহা ওয়া ফাদলুহা* (আল-মাকতাবুত তাআউনি লিদ-দাওয়াতি ওয়াল-ইরশাদ ওয়া তাওয়িয়াতিল জালিয়াত, দারমা; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০হি.)।

১০। সালেম বিন মুহাম্মাদ জুহানি সংকলিত *ফাতাওয়া মুহিম্মাতুন আন সলাতিল ফাজর* (দারুস সমিয়ি লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৯হি.)।

১১। মুহাম্মাদ বিন আলি শাওকানি রচিত *ফাতহুল কাদির* (দারুল ফিকর, বৈরুত)।

১২। মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকি রচিত *আল-মুজামুল মুফাহরাস লি-আলফাজিল কুরআনিল কারিম* (দারুল হাদিস, কাহেরা; প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭হি.)।

১৩। সাহেল বিন ফাওযান রচিত *আল-মুলাখখাসুল ফিকহিয়্যি* (দারু ইবনিল জাওযি, দাম্মাম; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩হি.)।

১৪। মুহাম্মাদ উসাইমিন রচিত *মিন আহকামিস সলাত* (দারুল মুসলিম লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৩হি.)।

১৫। সাইদ বিন আলি কাহতানি রচিত *মানযিলাতুস সলাত ফিল ইসলাম* (জিহাযুল ইরশাদি ওয়াত-তাওযি বিল-হারাসিল ওয়াতানি, রিয়াদ; প্রথম সংস্করণ, ১৪২২হি.)।

১৬। সালেহ বিন আব্দুল্লাহ সম্পাদিত *মাওসুআতু নাদরাতিন নায়িম ফি মাকারিমি আখলাকির রাসুলিল কারিম* (দারুল ওসিলাহ; প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮হি.)।

১৭। *মাজাল্লাতুল উসরা।*

১৮। *মাজাল্লাতুল মুজতামা।*

প্রতিটি পিতামাতার মনেই সৎ বংশধর লাভের বাসনা থাকে। যেমন, কুরআনে উল্লেখিত হজরত যাকারিয়্যা (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ায় আমরা ব্যাপারটির ইঙ্গিত পাই, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শুনে থাকেন।" (সুরা আলে ইমরান: ৩৮) এই বইটি সে-ক্ষেত্রে আপনার প্রথম পদক্ষেপ, অর্থাৎ বংশধরদের নামাজের ওপর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে। এটি পড়ার সময় আপনার মনে হবে, আপনি বাচ্চাদের বাবা-মা ও মুরব্বি বেষ্টিত বড়ো এক গল্পের আসরে বসে আছেন, যেখানে তারা সকলে আপনাকে একের-পর-এক তাদের অভিজ্ঞতা শুনিয়ে যাচ্ছেন। অতএব, আপনি সেগুলো মনের কানে শুনুন, তারপর আপন ঘর সুসজ্জিত করে তোলার অভিপ্রায়ে সেগুলো থেকে নিজের পছন্দমতো উপযুক্ত পদ্ধতি বাছাই করে নিন। আশা করি, এর প্রয়োগে আপনার সন্তান হয়ে উঠবে নামাজি আর সেই সৌরভে আপনার ঘর হয়ে উঠবে ইমানের সুবাসে সুরভিত।